শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

দৃশ্যাবলী

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড
৬৮, কলেজ স্ট্রীট/কলিকাতা-৭০০০৭৩

DRISHYABALI

A Novel

by

SHIRSENDU MUKHOPADHYAY

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮ কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
শ্রাবণ, ১৩৭০

প্রচ্ছদ :
পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮ কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

বা—স্বা

শ্রীরতনতনু ঘাটি

স্নেহাস্পদেষু—

বুড়ো বাপকে নিয়ে দেবব্রত যখন দমদম এয়ারপোর্টে নামল তখন সে হা-ক্লান্ত, বিপর্যস্ত, শঙ্কিত। দমদম, কলকাতা, ভারতবর্ষ এ সব সম্পর্কে তার কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই. এয়ারপোর্টে কেউ তাদের নিতে আসেনি। আসবে না—এটা একরকম জানাই ছিল। কারণ সময়মতো খবর দেওয়া হয়নি। একটা টেলিগ্রাম করা হয়েছিল শেষ সময়ে তাদের একটা স্যুটকেস ট্রানজিটে হারিয়ে গেছে। কোন্ অকূলে গিয়ে সেটা পড়েছে এবং তা আদৌ পাওয়া যাবে কিনা তা নিয়ে প্রবল উদ্বেগ রয়েছে দেবব্রতর। তার মধ্যে অন্যান্য মূল্যবান জিনিসের সঙ্গে রয়েছে তার বাবার বিবিধ ওষুধ এবং চিকিৎসার ধারাবাহিক ইতিহাস। সেটা পাওয়া না গেলে কলকাতায় তার বাবার চিকিৎসার বেশ অসুবিধে হবে। দেবব্রত দিল্লির কাস্টমসে খুব ভাল ব্যবহার পায়নি। মার্কিন পাসপোর্টধারী ভারতীয়রা ভারতবর্ষে খুব ভাল ব্যবহার পায়ও না বলে সে শুনেছে। তার জিনিসপত্র যথেষ্ট হাঁটকানো হয়েছে এবং বাপ-ব্যাটার শরীরও খোঁজা হয়েছে গোপন চোরাচালানের হদিস নিতে। দিল্লিতে দুদিন থাকতে হয়েছে স্যুটকেসের তল্লাসে।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে দেবব্রতর কোন আবেগ নেই, অহেতুক আতঙ্কও ছিল না। তবে এদেশ যে বেশ বিশৃঙ্খল, অলস, স্বাস্থ্যবিধি-উদাসীন এবং দুর্নীতিপরায়ণ তা সে জানে। তার জন্ম আমেরিকায়, সে বড় হয়েছে আমেরিকায়, পড়াশুনো করেছে আমেরিকায়। তথ্যগতভাবে ভারত তার পিতৃভূমি মাত্র। সে জীবনে কোনোদিন ভারতবর্ষে আসেনি। চব্বিশ বছর বয়সে এই প্রথম তার ভারত-দর্শন।

তাও হত না! জীবনে আর কখনোই আসা হত না যদি না আড়াই বছর আগে তার মা মারা যেত। সেই নিষ্ঠাবতী বাঙালী

হিন্দু মহিলা দীর্ঘ পঁচিশ বছর আমেয়িকায় বাস করেও দেশী প্রথা কিছু বর্জন করেনি। মা'র কাছেই পরিষ্কার বাংলা বলতে ও লিখতে শিখেছিল শুভব্রত আর দেবব্রত দুই ভাই। মা'র জন্যই নিউ ইয়র্কের বাঙালী সমাজের সঙ্গে ছিল তাদের গভীর যোগাযোগ। তার বাবা তপোব্রত দেহে মনে প্রাণে পুরোপুরি সাহেব হতে গিয়ে হতে পারেননি এই অতিশয় বাঙালী স্ত্রীর জন্য। তবে স্ত্রীকে যে তিনি শতকরা একশ' ভাগ ভালবাসতেন তার প্রমাণ স্ত্রীর মৃত্যুর পরই তাঁর আমূল বদলে যাওয়া। সেই হাসি-খুশি প্রাণচঞ্চল যুবজনোচিত চেহারার মানুষটি রাতারাতি বুড়ো হয়ে গেলেন। শুধু বুড়ো নয়, অথর্বও কিছুটা। প্রকাশ্যে শোক প্রকাশ না করে সেটাকে চেপে রাখার চেষ্টার ফলেই বোধহয় সেই শোক তাঁর শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ল, শুকিয়ে দিল তাঁকে। এবং যে মানুষ জীবনে কখনো স্বদেশমুখী হননি, মনে-প্রাণে বিদেশী হয়ে যাওয়াই ছিল যাঁর সাধনা, স্ত্রীর মৃত্যুর পরই তাঁর অস্বাভাবিক ঝোঁক দেখা দিল স্বদেশ প্রত্যাগমনের। কেবল বলতে লাগলেন, আর নয়, আমাকে তোরা ছেড়ে দে। আমি ওদেশে গিয়ে না মরলে শান্তি পাব না। এই ঝোঁক শেষে পাগলামীতে দাঁড়িয়ে গেল। সারাদিন বিড়বিড় করতেন, নানা আত্মীয়স্বজনের নাম উচ্চারণ করে একা একাই নানা কথা বলে যেতেন।

শুভব্রত চাকরি করে শিকাগোতে। তার বউ আমেরিকান। সুতরাং বাপের ব্যাপারে তার দায়িত্ববোধ প্রায় নেই-ই। কিন্তু দেবব্রতর ছিল। দায়িত্ববোধ নয়, নিজের বাবাকে খুব শিশুকাল থেকে, কে জানে কেন, সে গভীরভাবে ভালবাসে। বাপের প্রতি এই শ্রদ্ধাবোধ ও ভালবাসা জন্মাতে সাহায্য করেছিল তার মা। স্বামীকে মা শুধু ভালই বাসত না, ছেলেরাও যাতে ভালবাসে সেজন্য তাদের কাছে সব সময়ে তাদের বাবার প্রশংসা করত, গুণের দিকটা তুলে ধরত। মা'র মুখে কখনো বাবার নিন্দে শোনেনি দেবব্রত। বস্তুতঃ

মা'র মৃত্যুর পর নিউ ইয়র্কে তাদের সাত বেডরুমওয়ালা বড়সড় বাড়িটিতে সে আর বাবা একরকম একা হয়ে গেল। কিন্তু একাকীত্বের কষ্ট যতই হোক, বাবার অসুস্থতা আর অস্বাভাবিক মনের অবস্থার জন্য দেবব্রতকে একটা সিদ্ধান্তে আসতেই হল। ভেবে দেখল, বাবা যদি সত্যিই শান্তি পান তবে তাঁর দেশে যাওয়াই উচিত।

আপাততঃ দেশ যে তার খুব ভালো লাগছে এমন নয়। বাবাকে লাউঞ্জে বসিয়ে রেখে সে গিয়ে মালের জন্য দাঁড়াল। বিশাল বিশাল তিনটে স্যুটকেস, গোটা কয়েক বড় ব্যাগ, ক্যারি-অল ইত্যাদি সামলে নিয়ে যখন সে ফের লাউঞ্জে এসে দাঁড়াল তখন তপোব্রতর চোখে অনিশ্চয়তা, তিনি ক্লান্ত স্বরে বললেন, কেউ তো আসেনি দেখছি। বুধোকে তো টেলিগ্রাম করেছিলাম।

বুধো দেবব্রতর খুড়তুতো ভাই। বার দুই নিউ ইয়র্কে তাদের বাড়িতে গিয়ে থেকে এসেছে। দেবব্রতর মনে হয়, টেলিগ্রাম বুধো পায়নি, পেলে আসত ঠিকই। টেলিগ্রাম সে করেছে গতকাল, দিল্লি থেকে। নিউ ইয়র্ক থেকে খবর দেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু সেই খবর অনুসারে তাদের আসার কথা ছিল পরশুর আগের দিন। দিল্লিতে দুটো দিন যে খরচ হয়েছে সে খবর বুধোর পাওয়ার কথা নয়। দেবব্রত বলল, ভেব না বাবা, আমরা চলে যেতে পারব।

তপোব্রত খুব নিশ্চিন্ত হলেন না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মাত্র। এতকাল দেশে ফেরার জন্য যে উদগ্র আগ্রহ ছিল, সেটা যেন দেশে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিইয়ে গেছে।

দেবব্রত বেরোল ট্যাক্সির খোঁজে। এয়ারপোর্টে ট্যাক্সি খুব কম। একজনের কাছে এগিয়ে গিয়ে দেবব্রত যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে বলল, সেলিমপুর যেতে হবে। আমাদের কিছু লাগেজ আছে। এ গাড়ির লাগেজ-বুটে আঁটবে তো!

ড্রাইভারটা তাকে আড়চোখে দেখছিল, বলল, নব্বই টাকা লাগবে।

টাকা পয়সার হিসেবটা এখনো দেবব্রত জানে না। শুধু জানে, ডলারের তুলনায় টাকার দাম দশ ভাগের এক ভাগ এবং এখানে টিপস দিতে হয় না। সুতরাং মার্কিন হিসেবে ন' ডলারের বেশি পড়ছে না। ভাড়াটা তার কাছে বেশী বলে মনে হল না। তবু সে মিনমিন করে বলল, মিটারে কি অত উঠবে?

ড্রাইভার খুব দুঃখিত মুখ করে বলল, স্যার, মিটার দেখলে আমাদের চলে না, ট্র্যাফিক পুলিসকে খাওয়াতে হলে, রাস্তাও খারাপ আছে।

দেবব্রত আর দরাদরিতে গেল না। বলল, ঠিক আছে, আপনি অপেক্ষা করুন, লাগেজ নিয়ে আসছি।

দিল্লিতে কিছু ডলার ভাঙিয়েছিল দেবব্রত। সে টাকা ফুরিয়ে আসছে। যা আছে তাতে ট্যাক্সি ভাড়াটা হয়ে সামান্য কিছু থাকবে।

মালপত্র সব লাগেজ-বুটে আঁটল না। সামনের সিটে এবং পিছনেও রাখতে হল কিছু। মালপত্র এও সব নয়। বেশ কয়েকটা প্যাকিং বাক্স জাহাজে আসছে। তপোব্রত আর আমেরিকায় ফিরবেন না। দেবব্রতকেও বলেছেন, তুইও আর আমেরিকায় থাকিস না। এই যে এইডস নামে রোগটা এসেছে, মোটেই ভাল লক্ষণ নয়। ইনফ্লেশনটাও বেড়ে যাচ্ছে

অথচ এই তপোব্রত সেই পঞ্চাশের দশকে আমেরিকায় এসে আমেরিকান হওয়ার জন্যই প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। নিজের বাবার অনুরোধে বিয়েটা করেছিলেন দেশী মেয়েকে। আর সেই বিয়ের ফলেই তিনি কিছুতেই পুরোপুরি সাহেব বা আমেরিকান হয়ে যেতে পারেননি। তবু আমেরিকার প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ টান বা ভালবাসা এই সেদিনও ছিল। ছেলেদের উৎসাহই দিতেন পুরোপুরি সাহেব হবার জন্য।

গাড়িতে বসে দেবব্রত অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সঙ্গে বাইরের দিকে

চেয়ে শহরটাকে বুঝবার চেষ্টা করছিল। যা দেখছে তা তাকে ভরসা দিচ্ছে না, খুশি করছে না। গরিব দেশ বটে, কিন্তু এত নোংরা কেন? কেন এমন ধূলোমাখা? রাস্তায় এত মানুষ কেন?

গাড়ি অনেক ঘুরে ঘুরে চলছে: তপোব্রত পিছনে হেলান দিয়ে বসে কাচস্বচ্ছ অর্থহীন চোখে চেয়ে আছেন সামনের দিকে।

বাবা?

আঁ।

বাড়িতে পৌঁছেই তোমার ওষুধের নামগুলো একটা কাগজে লিখে ফেল। ওষুধের স্যুটকেসটা তো মিসিং।

তার কি দরকার? এখন থেকে এখানকার ডাক্তারই দেখাব। তাদের ওষুধই খাব যা গেছে গেছে।

দেবব্রত আরো কিছুক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে রইল। বাবার কথাটা যুক্তিযুক্ত। আমেরিকার ডাক্তারদের প্রেসক্রপশন এখানে চালু রাখার মানে হয় না। ওষুধও হয়তো মিলবে না। কিন্তু এখানকার ডাক্তাররা কেমন, ওষুধ কেমন, জলবায়ু কেমন এগুলো নিয়ে দেবব্রতর সন্দেহ আছে। সে যা শুনেছে তা আশাপ্রদ নয়। বাবাকে নিয়ে তার একটু দুশ্চিন্তা হচ্ছে। এতকালের জীবনধারা চট করে পাল্টে ফেলা সম্ভব কিনা, এবং সেটা ভাল হবে কিনা সেটা বুঝতে কিছু সময় দরকার।

বাইরের দিকে চেয়ে দেবব্রত যা দেখছে তাতে তার আতঙ্ক বাড়ছে, দুশ্চিন্তা গভীরতর হচ্ছে। এ তার পিতৃভূমি বটে, কিন্তু এমন বিদেশ তার কাছে আর কোনওটাই নয়। সে ইউরোপে দু তিনবার এসেছে, রাশিয়ায় গেছে, একবার জাপানেও এসেছিল। আমেরিকার মতো সমৃদ্ধ কোনও দেশই নয়। কিন্তু তবু সে সব দেশের চেহারায় এরকম ধূলোটে মালিন্যের ছাপ নেই, দারিদ্র্য এত দগদগ করে না।

বাবাকে রেখে দেবব্রত ইচ্ছে করলে ফিরে যেতে পারে। তার বাবা তাতে খুশি হবেন না বটে, কিন্তু তেমন বাধাও দেবেন না, দেবব্রত তা জানে। কিন্তু মুশকিল হল, সে তার বাবাকে অসম্ভব ভালবাসে। বাবাহীন আমেরিকায় ফিরে গিয়ে সে তিষ্ঠোতে পারবে না। কিন্তু এদেশে শুধু বাবার জন্যই দীর্ঘকাল বসবাস করা যাবে কিনা সেটাও সন্দেহের বিষয়।

ট্যাক্সি ড্রাইভার মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে তাদের দেখছিল। ইস্টার্ণ বাইপাস দিয়ে হুড়হুড় করে গাড়ি ছেড়ে সে এবার আচমকা প্রশ্ন করল, ফরেন থেকে এলেন স্যার?

দেবব্রত একটু চমকে গিয়েছিল। ফরেন থেকে আসছে বলে কি বাড়তি কিছু সুবিধে আদায় করতে চায় নাকি? সে মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

কোথা থেকে স্যার? আমেরিকা?

হ্যাঁ। আপনি বুঝলেন কি করে?

জাস্ট আন্দাজ।

ও।

ট্যাক্সিওয়ালা একটা ঠেলাগাড়িকে কাটিয়ে নিয়ে বলল, আমিও চার বছর ছিলাম।

দেবব্রত অবাক হয়ে বলল, কোথায়?

মিনেসোটায়। এক গুজরাটি বিজনেসম্যান তার গাড়ি চালানোর জন্য নিয়ে গিয়েছিল।

লোকটা আমেরিকায় ছিল জেনে দেবব্রত কেমন যেন একটু স্বস্তি বোধ করল। আমেরিকা তার দেশ না হয়েও যতটা দেশ, এ দেশটা তার স্বদেশ হয়েও ততটাই বিদেশ। ট্যাক্সি ড্রাইভার যে কিছুদিন আমেরিকায় ছিল তাতেই তার লোকটাকে আপন আপন লাগতে লাগল। দেবব্রত বলল, চলে এলেন কেন?

সে স্যার বিরাট হিস্ট্রি। একটা ড্রাগ ট্রাফিকং র‍্যাকেটে ফালতু

ফেঁসে গিয়েছিলাম। পুলিস ধরেনি, তবে মালিক টের পেয়ে সোজা টিকিট কেটে প্লেনে তুলে দিল।

ভালই করেছেন আপনার মালিক। ধরা পড়লে খুব মুশকিল হত।

জানি স্যার। ওই ঝুট ঝামেলায় পড়ে না গেলে আমার তো আমেরিকার সিটিজেনশিপ নিয়ে নেওয়ারই ইচ্ছে ছিল। দারুন জায়গা। আপনারা কোথায় থাকেন?

নিউ ইয়র্ক।

ওঃ, বিউটিফুল! ওরকম শহর আর নেই

আপনি গেছেন?

বহুবার। আমেরিকায় কোথায় যাইনি স্যার? মালিকের পরিবার বছরে তিন চারবার বেড়াতে বেরোত। মস্ত মস্ত ত্বটো কান্ট্রি ওয়াগন ছিল। একটা আমি চালাতাম। বহু জায়গায় গেছি স্যার। কি সব রাস্তা! গাড়ি একটুও চমকাত না। ওসব দেশে গাড়ি চালিয়ে এসে কলকাতার গাড্ডায় গাড়ি চালাতে ঘেন্না হয়।

এ কথাটায় দেবব্রত একটু হাসল। বাস্তবিক এ শহরের রাস্তাঘাট খুব ভাল বলে তারও মনে হচ্ছে না। এয়ারপোর্ট থেকে যে রাস্তায় গাড়িটা এল তা নিতান্ত মাঝারি। যে রাস্তা দিয়ে এখন যাচ্ছে তাও তেমন কিছু নয়, তবে জ্যাম নেই। কিন্তু ত্বর্গন্ধ আছে। বিশ্রী গা গুলিয়ে ওঠা গন্ধ।

ড্রাইভার বলল, এ বাইপাস তো তবু ভাল দেখছেন। শহরের ভিতরে অবস্থা খুব খারাপ। আপনারা ক'দিন বাদে এলেন স্যার?

তপোব্রত এই সংলাপে অংশ নিচ্ছেন না। পিছনে হেলে বসে চোখ বুজে আছেন।

দেবব্রত বলল, বাবা এলেন পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর পর। আর আমি এই প্রথম।

প্রথম! বলে ট্যাক্সি ড্রাইভার একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে বিস্ময়ভরে দেখল।

দেবব্রত মৃদুস্বরে বলল, আমার জন্মই ওখানে। কখনও এদেশে আসা হয়নি।

ওঃ, তাহলে টিকতে পারবেন না। ধূলো, মশা, জ্যাম, ভিখিরি আপনার লাইফ একদম হেল করে দেবে। খারাপ গন্ধ পাচ্ছেন স্যার? ওই সামনে ধাপা।

ধাপা! হ্যাঁ, জায়গাটার নাম শুনেছি। শহরের ময়লা ফেলা হয় না এখানে?

আজ্ঞে বহুত গান্ধা শহর স্যার। চান তো একদিন শহরটা আপনাকে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেব। নো বারগেন, নো প্রফিট, শুধু তেলের দামটা দিয়ে দেবেন।

আচ্ছা, দেখা যাবে।

আমি টাকা জমাচ্ছি স্যার। পাসপোর্টটাও রিনিউ করিয়ে রাখি টার্ম ফুরোলে। সুবিধে হলেই ফের চলে যাব। আপনি তো স্যার আমেরিকার সিটিজেন?

হ্যাঁ। আমরা সবাই।

তাহলে আমাকে একটু বুদ্ধি দেবেন স্যার? জীবনে আর একবার ওদেশে যাওয়ার চান্স চাই। গেলে আর ফিরব না।

এখন সিটিজেনশিপ পাওয়া খুব মুশকিল।

জানি। আমি তো এয়ারপোর্টেই বেশির ভাগ ওত পেতে থাকি। আমেরিকার লোক পেলেই সওয়ারি নিই। তাদের কাছে শুনেছি। তবু চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি স্যার। আপনি যদি একটু হেল্প করেন।

ভেবে দেখব কি করা যায়।

ওখানে আমার একজন ফিয়াসেঁও ছিল স্যার।

এখনও আছে?

না। দু মাস আগে বিয়ে করেছে। চিঠি দেয় মাঝে মাঝে। কিন্তু ওটা কোনো ব্যাপার নয়। আমেরিকায় কি স্যার মেয়েছেলের

অভাব! আমার ওসব সেন্টিমেণ্টও নেই। আমি যাব আমেরিকা দেশটাকে ভালবাসি বলে। একবার ঢুকে পড়লে আর বেরোব না। ইমিগ্রাণ্ট ভিসা না পেলে পালিয়ে থাকব।

দেবব্রত নিজেও এত আমেরিকা-প্রেমিক নয়। সে মৃদু একটু হাসছিল, বলল, পালিয়ে থাকার অনেক বিপদ আছে। তার দরকারই বা কি? চেষ্টা করুন, ঠিক চান্স পেয়ে যাবেন।

আপনি একটু হেল্প করবেন স্যার?

আমি তো এখন এদেশেই থাকব।

লোকটা চোখ কপালে তুলে বলল, এদেশে থাকবেন! মাথা খারাপ নাকি স্যার! আপনার মার্কিন পাসপোর্ট আছে, আপনি সিটিজেন, এদেশে কোন্ দুঃখে থাকতে যাবেন?

যতদিন পারি থাকব! তারপর দেখা যাবে।

লোকটা ডানদিকে একটা কানেকটিং রোড ধরে কলকাতায় ঢুকে পড়ল। এবেড়ো-খেবড়ো রাস্তায় গাড়ি লাফাচ্ছে, গতি কমে গেছে, ধুলো উড়ছে। দেবব্রত কলকাতার বিস্তর আদ্যিকালের যানবাহন দেখে চলল, টানা রিকসা, সাইকেল রিকশা, ঠেলাগাড়ি, সাইকেল ভ্যান। দেখতে লাগল খোলার বা টিনের চালের ঘর, মাটির বাড়ি, পাশাপাশি আবার সব চকচকে অ্যাপার্টমেণ্ট হাউস। তৃতীয় বিশ্ব এরকম বলেই সে শুনেছে, কিন্তু চোখে দেখলে অদ্ভুত হাস্যকর লাগতে থাকে, মনে হয়, এদেশে খুব আহাম্মক ও অকর্মণ্য লোকেরা থাকে। এদের রুচি নেই, উদ্যম নেই।

রাস্তার অবস্থা দেখছেন স্যার!

দেখছি।

গোটা শহরটাই এরকম। তিন দিন বাদে পালাতে চাইবেন।

তবু এ তো আমার দেশ।

আমার স্যার ওসব সেন্টিমেণ্ট নেই। দেশ আবার কি? মরলে কেউ দেখার আছে এখানে? আমি তো জানি এ দেশটা

মাড়োয়ারি, কালোয়ার, ব্ল্যাকার আর মস্তানদের দেশ। আমরা ফালতু ফিল্ডার।

দেবব্রতর লোকটাকে বেশ ভাল লাগছিল। স্পষ্টবক্তা, ধানাই পানাই নেই। সে তার বাবার দিকে আর একবার চেয়ে দেখল। তপোব্রতকে বেশ বিবর্ণ আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে। এতকাল পরে দেশে ফিরলেন, কিন্তু সেই উৎসাহে যেন ভাঁটা পড়েছে। হয়তো তিনিও ভাবছেন আমেরিকা ছেড়ে দেশে চলে আসার সিদ্ধান্তটা সঠিক হয়নি।

বাবা!

তপোব্রত চোখ না চেয়েই বললেন, উঁ।

শরীর ঠিক আছে তো!

ঠিক আছে।

গাড়ি অনেক চড়াই উতরাই পেরিয়ে, টাল খেয়ে, ধূলো উড়িয়ে এবং পাক খেয়ে অবশেষে একটা গলির মধ্যে ঢুকল। ড্রাইভারই ঠিকানা খুঁজে চারতলা এক বাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে বলল, এই যে স্যার, এই বাড়ি।

দুই

মাংসের দোকানের সামনে মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। ঝোলানো খাসীর গোলাপী শরীরের দিকে নিবিষ্ট চোখ। খুঁজছেন নিবিড় মাংস, মুড়মুড়ে হাড়, টাটকা কলিজা। চমৎকার দৃশ্য। মাংসের খোঁজে মাংস!

না, ছি ছি, কথাটা বলা বোধহয় উচিত হল না। মেয়েদের মাংস হিসেবে দেখার মতো কিছু পুরুষ অবশ্যই পৃথিবীতে আছে। হয়তো তারাই সংখ্যায় বেশী। কিন্তু আমি তো সে দলে নই। তা ছাড়া রুমকিকে মাংস মনে করার তেমন কোনো কারণও নেই।

মাংসের দোকানের সামনে ওই যে মহিলা দাঁড়িয়ে ও রুমকি।

এক সময়ে আমি রুমকিকে চিনতাম বলতে কি তার সঙ্গে আমার বিয়েও হয়ে যেত, যদি—

যদি না আমি নান্নুকে খুন করে জেলে যেতাম।

নান্নুকে খুন করতে হয়েছিল নান্নুর জন্যই। এমনই দুরন্ত, দুর্দান্ত হয়ে উঠেছিল নান্নু যে তখনই তাকে শেষ না করলে জল অনেক দূর গড়াতে পারত। তাই দত্তগুপ্ত আমাকে তার সেই বিখ্যাত কুটিরে ডাকিয়ে নিয়ে একদিন সকালে হুকুম দিল, টারমিনেট নান্নু।

দত্তগুপ্তের কুটিরটি প্রায় তপোবনের মতো। চারদিকে ফুল ও ফলের বাগান। বেশ পরিপুষ্ট ঘাস হত বাগানে। দত্তগুপ্ত ছাগল, গরু, কুকুর এবং হরিণ পুষত তার কুকুরটিও ছিল গরুর মতোই অহিংস। কুটিরের দরজায় লতানো কুমড়ো গাছ, কুটিরের খড়ের চালে লাউ। মাটির দেয়ালে আলপনা। ঘরে একটি মজবুত তক্তপোশ, কয়েকটা আলমারি, একটা লেখাপড়ার টেবিল, একটি গদি আঁটা লোহার চেয়ার। দত্তগুপ্ত খড়ম পায়ে দিত, কালীপূজো করত, দুধ দোয়াত, কুয়ো থেকে জল তুলত, মাথায় জটা রাখত। তবু দত্তগুপ্ত আসলে দত্তগুপ্তই। নিজে কুটিরে থাকত বটে, কিন্তু সামনের দিকে ছিল তার আদত পৈতৃক তিনতলা প্রকাণ্ড বাড়ি। সেখানে তার বুড়ি মা, চার বিবাহিত সংসারী দাদা, এক বিধবা দিদি ও তাদের কাচ্চাবাচ্চাদের বাস। সাংসারিক জীবন এবং হৈ-হট্টগোল এড়াতে বাড়ির পিছন দিকে সাহাবাবুদের পড়ে থাকা প্রায় দেড় বিঘে জমি সে দখল করে নেয়, বাগান করে এবং তপোবন সৃষ্টি করে ফেলে। এ নিয়ে জল ঘোলা হয়েছিল বটে কিন্তু দত্তগুপ্তকে হটানো যায়নি। সেই নিমীলিত চোখ, উর্ধ্বদৃষ্টি মাঝে মাঝে আচমকা আধ্যাত্মিক দীর্ঘশ্বাস এবং দাড়ি গোঁফ সম্বলিত শান্ত মুখশ্রী নিয়ে দেড় বিঘে জমির একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে সে নিজের হরিণকে আদর করত, গরুর গলকম্বলে হাত বোলাত, কুকুরের মাথা চুলকে দিত, ছাগলকে কোলে নিত, বেড়ালকে স্নান করিয়ে দিত, গাছে গাছে

সিঞ্চন করত জল। রক্তাম্বর, খড়ম, রুদ্রাক্ষ সবই ছিল তার। তার তপোবনে ছিল অগাধ শান্তি। লাশ টাশ যা পড়ত তা বাইরে। বোমা বন্দুকের শব্দ তার কুটিরে পৌঁছোত কমই। কিন্তু এলাকায় যা কিছু ঘটত, যত লাশ পড়ত, যত চোরাই মালের লেনদেন হত, যত চোলাই আর জুয়ার খেলা চলত তার স্নায়ুকেন্দ্র ছিল ওই তপোবন যত হুকুম বেরোত দত্তগুপ্তরই মুখ থেকে। সাহাবাবুদের জমি দখল করেছিল সে, পরে সেই সাহাবাবুদেরই মেজো তরফ সেই জমি ঘিরে উঁচু দেওয়াল তুলে দেয়।

আমরা অনেকেই দত্তগুপ্তের ডান হাত বলে নিজেকে ভাবতাম যে সমীহ, খাতির এবং সম্ভ্রম আমরা এলাকার লোকজনের কাছ থেকে পেতাম তা ছিল দত্তগুপ্তের রিফ্লেক্টেড গ্লোরি। দত্তগুপ্ত যদি সূর্য, তবে আমরা তার গ্রহমণ্ডল আমরা যথেষ্ট কৃতজ্ঞ ছিলাম। মাঝে মাঝে কিছু বিবমিষা উদ্রেককারী কাজ করতে হত বটে, তবু দত্তগুপ্তের কৃপাতেই আমাদের বেকার পকেটে কিছু পয়সা আসত। দত্তগুপ্ত আমাদের কিছু গৌরবও দান করেছিল।

এমন কি ওই যে রুমকি, নিচু হয়ে খাসীর সামনের ডান পায়ের গোড়ায় আঙুল তুলে কসাইকে ওইখান থেকে কাটতে বলছে ও পর্যন্ত আমাকে পাত্তা দিয়েছিল দত্তগুপ্তের জন্যই। নইলে কেই বা চিনত আমাকে?

কলকাতা এবং শহরতলীতে কিছু পাড়া আছে যেগুলি মোটামুটি একটি রাজনৈতিক দলের দ্বারা শাসিত। সেগুলো একরকম শান্ত পাড়া। বিশেষ করে যে সব পাড়ায় এক আধজন জেদী বা কর্তব্যপরায়ণ নেতা থাকেন, যাঁর ধান্ধাবাজি নেই, যিনি করাপ্ট নন। কিছু পাড়া আছে যেখানে একাধিক দলের ঠেলাঠেলি। এ সব জায়গায় কিছু হাঙ্গামা থাকেই। আর কতগুলো পাড়া থাকে যেখানে প্রত্যক্ষ কোনো দলের শাসন নেই। এ সব এলাকাতেই দাপটে রাজত্ব করে খুনে গুণ্ডা বদমাশ। আমার এলাকাটা এই তিন নম্বর শ্রেণীর। এ

পাড়ার শাসক দত্তগুপ্ত, যার কোনো রাজনৈতিক দলে টিকি বাঁধা নেই। তবে প্রয়োজনবোধে সে এক একসময় এক এক দলে নাম লেখায়, বিশেষ করে যারা ক্ষমতায় থাকে। দলও তার প্রয়োজন মেটায়, কারণ দত্তগুপ্তকে হাতে রাখলে ক্ষতি নেই, না রাখলে আছে।

আমার এলাকার নাম উহ্য থাক।

পাঠক পাঠিকা বোধহয় নায়ক, নায়িকা ও ভিলেনের গন্ধ পেয়ে গেছেন। ভিলেন দত্তগুপ্ত, নায়ক আমি, নায়িকা রুমকি কিনা তাই না? দেখা যাক।

বস্তুতঃ নায়িকা হওয়ার মতো ব্যাপার স্যাপার রুমকির ছিল এখনও আছে। ওই যে দেখুন না, মাংসের দোকানের সামনে রুমকি ঝুঁকে দাঁড়িয়ে। মখু চোখ ল্যা-ল্যা লোভ ঝুলে আছে। তবু লক্ষ্য করলে আপনি ওর মুখশ্রীতে এমন ভাস্কর্য দেখবেন যা খাজুরাহো বা ভুবনেশ্বরের মন্দিরগাত্রে সুন্দরী রমণীদের পাথুরে মুখে থাকে। পাথুরে কথাটা মনে রাখবেন দয়া করে। রুমকির মুখ খুব উঁচুদরের শিল্পীর সূক্ষ্ম খোদাই কাজের মতো বটে, কিন্তু ভীষণ পাথুরে। তার ঢলঢল লাবণ্যের মধ্যেও একটা জমাট বাঁধা ব্যাপার আছে। খুব সুন্দর, তবু যেন বড্ড কঠিন। আর, ওই ওর হাত— কসাইয়ের দিকে বাড়ানো মোলায়েম আঙুলে ধরা লাল টুকটুকে নাইলনের ব্যাগ ওর হাত দুটি বরাবর আমার পছন্দের ছিল, যেন হাড়গোড় নেই এমন লতানে সতেজ, বাত্ময় উষ্ণ। দুটি স্তন সামনে ঝুল খেয়ে আছে, শাড়ির আড়ালে—লক্ষ্য করুন। ও যখন সোজা হয়ে দাঁড়াবে, দেখবেন, এখনো দুটি স্তন যেন বুক ছেড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়তে চায়। এমন চমৎকার গড়ন খুব কম দেখা যায় আজকাল। পেটের দিকে একটু চর্বি জমে যাওয়া স্বাভাবিক। চার বছর আগে ছিল না, এখন হয়েছে। বাঙালী মেয়েরা শরীরের যত্ন নেয় না, খাওয়ার নিষেধ মানে না, সামান্য বয়স হলেই তাই মুটিয়ে যেতে থাকে। রুমকির শরীরে সেই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কি?

চার নয়, পাঁচ বছর আগে রুমকিকে আমি প্রথম লক্ষ্য করি দত্তগুপ্তের বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামছে। খয়েরী রঙা গাড়ি থেকে দরজা খুলে নীল শাড়ি আর জরির পাড়ে ঘেরা ফর্সা পা নেমে এল মাটিতে, সাদা চটি সেই পায়ে। গেট-এর কাছে বসে আমি আর টুলু সিগারেট টানছিলাম। আমার সিগারেট পড়ে গেল।

রুমকি দত্তগুপ্তের কাছে এসেছিল একটু বৈষয়িক কাজে। এ পাড়ার প্রথম ওনারশিপ ফ্ল্যাটবাড়ির একটার মালিক তারা। জমি কেনা হয়েছে, কিন্তু দখল পাচ্ছে না, পাড়ার লোক বাগড়া দিচ্ছে। জনৈক সনাতন ভৌমিক ওটা ভেস্ট জমি বলে আদালতে মামলা ঠুকে দিয়েছে। নানারকম গণ্ডগোল।

দত্তগুপ্ত সমস্যাটা মিটিয়ে দিল। তবে ফ্ল্যাট-মালিকদেরও পকেট থেকে আরো কিছু গেল আর কি।

ফ্ল্যাটবাড়ির বখেরা মিটিয়ে দিয়েছিল দত্তগুপ্ত নিজেই, কত চাক্কি সে ঝাঁক দিয়েছিল তা সে-ই জানে। আমরা কোনো হিস্যা পাইনি, তবে কণ্ট্রাক্টরের কাছ থেকে আমরা কয়েকজন কিছু কষে নেওয়ার ফিকিরে ছিলাম, তখন কি আর জনতাম যে, ঠিকাদারটা আবার রুমকির জামাইবাবু? রুমকিকেই চিনি না তখন।

ইট বালি লোহা-লক্কড় আর সিমেণ্টের বস্তা এসে পড়তেই আমরাও হানা দিলাম। আমাদের প্রস্তাব বেশ সহজ এবং গ্রহণযোগ্য। ঠিকাদারকে বললাম, আপনার দারোয়ান রাখার দরকার নেই, ওসব আমরাই পাহারা দেব। কত দেবেন বলুন।

ঠিকাদার গাঁইগুঁই শুরু করল।

নান্নু বলল, দাদা, সাফ কথা শুনবেন? কোনো দারোয়ানের ক্ষমতা নেই এসব জিনিস বাঁচাতে পারে। আমাদের সঙ্গে বন্দোবস্তে না এলে মাল সাফ হয়ে যাবে।

ঠিকাদার বলল, তোমাদের হেফাজতে দিলেই যে মাল ঠিক থাকবে তার গ্যারাণ্টি কি? তখন কি মাল চুরি যাবে না?

নান্নু বিবেচকের মতো মাথা নেড়ে বলল, যাবে, তবে কম। আপনি যদি টেন থাউজ্যাণ্ড ডাউন করেন তো মালে মাছিও বসতে দেব না। যদি ফাইভ দেন তো বাকি ফাইভ আমরা তুলে নেব মালের ওপর দিয়ে।

আর যদি তোমাদের কিছুই না দিই ?

তাহলে পরে আমাদের দোষ দেবেন না। আমরা ওয়ার্নিং দিয়েই যাচ্ছি।

ঠিকাদার লোকটা খুব সোজা নয়। তার নাম প্রণব চৌধুরী। আমরা জানতাম না যে, তার কয়েকজন এক গেলাসের ইয়ার ছিল। মাল খাওয়ার দোস্তি খুব জব্বর জিনিস। তার ইয়ারদের মধ্যে কয়েকজন পলিটিক্যাল ভি. আই. পি-ও ছিল। আর রাজনীতির ভি. আই. পি-দের ছিল বডিগার্ড। কে না জানে এই সব বডিগার্ডরা মস্তান ছাড়া আর কিছু নয়। চৌধুরী পরদিন এরকম দুজন মস্তানকে তার গাড়ি করে নিয়ে চলে এল।

মস্তানি জিনিসটা আসলে একটা প্রফেশন্যালিজম। যত পারা যায় ঝেঁকে নেওয়া। এর মধ্যে বীরত্ব নেই, রুস্তমি নেই, নিষ্ঠুরতারও কথা আসে না। পেশাদার মস্তানেরা না হক ঝামেলায় জড়াতে চায় না। চৌধুরী যাদের হাজির করল তাদের আমরা চিনি না বটে, কিন্তু আবডালে থেকে চেহারা দেখে মালুম হল, এরা পেশাদার বটে। দরকারে খুনখারাপি ঠাণ্ডা মাথাতেই করে দেবে, কিন্তু খামোখা ঝামেলা মাচাবে না, মস্তানেরা সহজে অন্য মস্তানদের সঙ্গে লাগেও না।

আমরা দৃশ্যটা খুব শান্তভাবেই দেখলাম। তারপর নিজেরা অ্যাকশনে নামার আগে দত্তগুপ্তর কাছে গিয়ে হাজির হলাম।

শীতের শেষ। দত্তগুপ্ত সকালের পুজোপাঠ সেরে সাদা পাথরের গেলাসে চা খাচ্ছে রোদে বসে। আমরা গিয়ে দাঁড়াতে শুধু একবার তাকাল। কোনো কথা বলল না বা প্রশ্ন করল না।

নান্নু বলল, ঠিকাদারটা জুটো রুস্তমকে নিয়ে এসেছে

দত্তগুপ্তর মুখ এতক্ষণ ভারি প্রশান্ত ছিল। একথায় হঠাৎ চোখে একটা খুনিয়া ঝলক খেলে গেল। চাপা, কিন্তু মেঘগর্জনের মতো বুক-গুড়-গুড়-করা স্বরে বলল, ঠিকাদারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে গিয়েছিলি কেন?

সবাই তো দেয়, ও দেবে না কেন?

দেবে না। আমি বারণ করেছি। এখন যা, ওদের ঘাঁটাসনি।

লাথি-খাওয়া কুকুরের মতোই আমাদের ফিরে আসতে হল। তবে আমরা বুঝলাম, ঠিকাদার দত্তগুপ্তকে ভালরকমই খাইয়েছে, আর দত্তগুপ্তও তাকে গ্রীন সিগন্যাল দিয়েছে। আমরা ফালতু। ওস্তাদ যখন টাকা খেয়েছে তখন চেলাদের আর তুবারা দিতে যাবে কোন আহাম্মক?

নান্নু অশ্রাব্য একটা খিস্তি করে বলল, ঠিকাদারটাও শালা হারামি। ও জুটো রুস্তমও তো কিছু কম খিঁচে নিচ্ছে না। সেই টাকাটা আমাদের দিলে কি রাজ্য চলে যেত?

আমি নান্নুকে সাবধান করে দিয়ে বললাম, ওসব আর মুখে আনিস না। যা হওয়ার হয়ে গেছে।

একটা চায়ের দোকানে আমরা নতুন আড্ডা গেড়েছিলাম। সেখান থেকে ফ্ল্যাটবাড়ির সাইটটা দেখা যায়। ঠিকাদারের লোকেরা সিমেন্ট বাঁচাতে একটা চালা তুলেছে। সেই চালার ছায়ায় বসে জুই রুস্তম খুব ঠাণ্ডা চোখে চারদিকটা দেখে নিচ্ছিল।

আমাদের কিছুই করার ছিল না।

নান্নুর চেহারাটা সত্যিই ভাল। এমন চ্যাপ্টা আর চওড়া চেহারা খুব কম দেখা যায়। তার মাংসপেশীগুলোও একেবারে চ্যাপ্টা ধরনের, অর্থাৎ সেগুলো চামড়ার তলায় কিলবিল করে না, কিন্তু ইস্পাতের স্প্রিং-এর মতো সেগুলোর ক্ষমতা। গায়ে বাঘা জোর থাকলেও মস্তানিতে ওসব তেমন কাজে লাগে না। মস্তানদের

কলাকৌশল অন্য রকম। বুদ্ধি, ঠাণ্ডা মাথা, গাট্‌স্ আর কিছু যন্ত্রপাতি। নান্নুর সে সবও আছে। আর যেটা আছে, সেটা হল ভয়ংকর রাগ আর বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি রকমের মান-অপমান বোধ। চায়ের দোকানে বসে ঠিকাদারদের দুই ভাড়াটে রুস্তমের দিকে চেয়ে সে আপনমনে শ্বাসে প্রশ্বাসে খিস্তি দিয়ে গেল পুরো একবেলা। ঘটনাটায় তার পৌরুষ আহত হয়েছে, বুঝতে পারছি, কিন্তু ডিসিপ্লিন বলেও একটা জিনিস আছে। আমাদের সেটা ভাঙা উচিত হবে না।

ঠিকাদারের দুই রুস্তম রোজ এসে সকাল থেকে টানা মেরে বসে থাকে, রাতের দিকে আসে আর দুজন। তারাও একই রকম নির্বিকার এবং পেশাদার। দিন সাতেক তারা পাহারা দিল। এর মধ্যে দত্তগুপ্তের তপোবনে বারকয়েক হানা দিল প্রণব চৌধুরি। দিন সাতেক বাদে ঠিকাদার তার ভাড়াটে রুস্তমদের সরিয়ে দিল। বাড়ি উঠতে লাগল ধাঁ-ধাঁ করে। বুঝলাম দত্তগুপ্ত ঠিকাদারকে অভয় দিয়েছে।

মাস খানেক কাজ চলল নির্বিঘ্নে। পিলার মাথা তোলা দিতে লাগল, ঘরঘর করে কংক্রিট মিকশার ঘুরতে লাগল, সিমেন্টের ধুলো উড়তে লাগল চারপাশে, ঠনাঠন শব্দ উঠতে লাগল লোহা লক্কড়ের। চায়ের দোকানে বসে আমরা দেখি।

একদিন সাঁ করে একটা গাড়ি এসে থামল। আমি নান্নুকে কনুইয়ের একটা গুঁতো দিলুম, দেখ নান্নু।

নান্নু বিরস মুখে বলল, দেখার কি আছে! ভাল মাল ভাল লোকেদেরই ভোগে যায়।

ভিতরে ভিতরে নান্নু গজরাচ্ছিল। আমি দেখছিলাম রুমকিকে। গাড়ি থেকে একটা হালকা নীল ঝলক তুলে নামল। রোদচশমা পরা চোখ তুলে বাড়িটা দেখল একটু। সঙ্গে প্রণব। দেখার মতোই জিনিস রুমকি। নান্নুও দেখছিল।

অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে ঘুরে চারদিকে যৌবনের সৌন্দর্যের সোনার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিচ্ছিল। এতে কার কি প্রতিক্রিয়া হল বলা শক্ত

কিন্তু আমার জীবনে প্রথম ইচ্ছে হল, ওই মেয়েটার সামনে গিয়ে নিজের বুকে গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করি।

প্রেমে পড়লে কি এরকম হয় নাকি ?

প্রেম বা আশনাই আমার আরো দু একটা মেয়ের সঙ্গে আছে। তারা খুব ছাপোষা ধরনের, নির্জীব, লোভী, ঝগড়ুটে, নিম্নবিত্ত, অসুন্দরী। তাদের একমাত্র গুণ তারা মেয়ে। আর কিছু নয়।

রুমকি শুধু মেয়ে নয়, কিংবা দুনিয়ার বহু সুন্দরী মেয়েকে নিংড়ে ছেঁকে তবে রুমকি তৈরি হয়েছে।

সেই রাতে ফ্ল্যাটবাড়ির বিস্তর মাল চুরি গেল। দারোয়ান অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল মাটিতে। মাথা ফেটে রক্তের বন্যা বইছে।

তিন

তিন দিন বাদে দেবব্রত তার দাদা শুভব্রতকে যে চিঠিটা লিখল তার বাংলা করলে দাঁড়ায়, প্রিয় দাদা, আমরা একটা অদ্ভুত গর্তের মধ্যে এসে পড়েছি বলে মনে হচ্ছে। কি বলব তোমাকে, এ দেশ যেন স্লো মোশনের একখানা ছবি। মানুষজন থেকে শুরু করে তাদের জীবনযাত্রা সবই ধীরগতি, আলস্যজড়িত, জরাগ্রস্ত, উদ্যমহীন। এত বিবর্ণ শহরও আমি জীবনে দেখিনি। জানি না গ্রামগঞ্জ কিরকম শুনেছি তা আরও খারাপ। এখানকার খাবার খারাপ, জল, বাতাস সব কিছুই খারাপ, আমার ইতিমধ্যেই পেটের একটু গোলমাল শুরু হয়েছে। বাড়িটা বেশ পুরোনো, ছিরিছাঁদহীন। তবে কোনোরকমে থাকা যায়। বাবা তাঁর দেশে এসে যে খুব ভাল বোধ করছেন তা মনে হচ্ছে না। তবে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে খুব কথা বলছেন। এই সব আত্মীয়ের মধ্যে আমি শুধু বুধোদাকে চিনি। আর কাউকে নয়। তবে তিন দিনে মোটামুটি সকলের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। এরা ভীষণ

কথা বলতে ভালবাসে। শহরের রাস্তাঘাট খুব খারাপ। এত ভিড়ও আমি জীবনে দেখিনি। বুধোদা আমাকে কাল শহর দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। ময়দান, গঙ্গার ধার ইত্যাদি। সন্দেশ কচুরিও খাওয়াল। কিন্তু অভিজ্ঞতাটা খুব নতুন হল না। গঙ্গা অত্যন্ত বাজে নদী। আরও কয়েকটা জায়গায় যাওয়ার কথা হচ্ছে। শান্তিনিকেতন, দার্জিলিং, সিমলা, পুরী। হয়তো জায়গাগুলো ভালই। দেখা যাক। এখানে কাছাকাছি কোনো পার্ক নেই, জিমনাসিয়াম নেই, সুইমিং পুল নেই, ভাল ক্লাব নেই, টেনিস কোর্ট বা গল্‌ফ লিংক কোথায় আছে তা এরা ভেবে পেল না। খুব হাঁফ ধরে যাচ্ছে। বক্সিং কোথায় করা যায় তা আর জিজ্ঞেস করিনি। কেন না ওসবের খবর এরা রাখে না। আমাদের জিনিসপত্রগুলো এরা সব হাঁ করে করে লোভীর মতো দেখছে আর ছুঁচ্ছে। উপহার পেয়ে সবাই খুব খুশী। আমাদের একটা স্যুটকেস খোওয়া গেছে ট্রানজিটে। এখনোও সেটার কোনো খবর নেই। বাবার ওষুধ আর প্রেসক্রিপশন সব তার মধ্যে ছিল। এখানকার ডাক্তার বাবাকে দেখছে। বলছে, সব ঠিক হয়ে যাবে। শুনছি ডাক্তারটি এম আর সি পি। ভালও হতে পারে। কাল রাতে আমি বাবাকে বলেছি, আমি ফিরে যেতে চাই। বাবা একথার জবাব দেননি। বোধহয় একটু হতাশ হলেন। কিন্তু আমার আর কি করার আছে? এ বাড়িতে একটা টেলিফোন আছে। সেটা বুধোদার। তবে সেটা ডেড। কবে ঠিক হবে তার কিছু ঠিক নেই। ঠিক হলে আমি তোমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলব। ভালবাসা নাও। বউদিকেও জানাচ্ছি গভীর ভালবাসা। দেবব্রত।

চিঠিতে যতটুকু সে লিখল বাস্তব অবস্থা তার চেয়েও খারাপ। এ বাড়িতে পা দেওয়ার পর থেকেই সে একটা টেনশন টের পাচ্ছে। আত্মীয়েরা মুখে হাসিখুশি ভাব দেখালেও আমেরিকা থেকে আত্মীয় সমাগমে এঁরা যে খুশি হননি তা বোঝা যাচ্ছিল।

চতুর্থ দিন দেবব্রত আর পারল না। শরীরকে এরকম বসিয়ে

রাখার অভ্যাস তার নেই। কাছাকাছি জিমনাসিয়ামের খোঁজ করে সে পায়নি। লেক-এ সাঁতার দেওয়ারও অসুবিধে আছে। এখানে তাদের গাড়ি নেই। চতুর্থ দিন খুব ভোরবেলা উঠে কেডস আর শর্টস পরে সে দৌড়োতে বেরল। কাছাকাছি রাস্তাগুলো সে চিনে নিয়েছে।

বড় রাস্তা পেরিয়ে আনোয়ার শা রোড ধরে অনেকটা দৌড়োনোর পর তার গা দিয়ে ভাপ বেরোতে লাগল। চনমন করে উঠল রক্ত। বেশ ভাল লাগল। শরীর থেকে অবসাদ, একঘেঁয়েমি ঝরে গেল। সে ভেবে পায় না এ দেশে কেন প্রায় সব লোকেরই ভুঁড়ি হয়। এমন কি বিশ বাইশ বছরের তরতাজা জোয়ান ছেলেদেরও সে অল্পবিস্তর ভুঁড়ি লক্ষ্য করে অবাক হয়েছে। ভুঁড়িহীন লোক কলকাতায় খুবই কম দেখা যায়। এদেশের মেয়েদের স্বাস্থ্য বড্ড ঢ্যাপসা বা চিমড়ে। শরীরের চর্চা যে অধিকাংশ মেয়েই করে না তা চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। স্বাস্থ্যের মতো এত বড় গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস সম্পর্কে এই উদাসীনতায় সে অবাক হয়।

এই যে একটা চওড়া রাস্তা দিয়ে সে দৌড়োচ্ছে এর দুপাশে সারিবদ্ধ সুন্দর সব গাছ থাকতে পারত। দুধারে রাখা যেত সবুজ কিছু ঘাসের জমি। এতবড় একটা শহরকে এরকম প্রকৃতিহীন ন্যাড়া করে দিলে যে শহরবাসীর পক্ষে আবহাওয়াটা দূষিত হয়ে ওঠে তাও কি এরা জানে না!

দেবব্রত একশ মিটার দূরত্ব এগারো সেকেণ্ডের কমে দৌড়োতে পারে। ফিরে আসার সময় একদম শেষ দিকে শ দুই মিটার হরিণ-ছুটে পার হল সে। ভাল করে আলো ফোটেনি। সবে ভোর হচ্ছে। লোকজন বাজার-টাজার করতে বেরোচ্ছে দু একজন করে, চায়ের দোকানে লোক জমছে, বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে বাবা বা মায়ের হাত ধরে। অনেকেই তার দিকে অবাক হয়ে তাকাচ্ছে।

বাড়িতে ঢুকবার সময় সদরে শিবানীর সঙ্গে দেখা।

এঃ মা, তুমি ওই খাটো প্যাণ্ট পরে রাস্তা দিয়ে দৌড়ে এলে!

দেবব্রত গত কয়েকদিন তার এই খুড়তুতো বোনটির সঙ্গেই যা একটু ভাব করে উঠতে পেরেছে। দেখতে ফুটফুটে সুন্দর, বছর আঠারো বয়সের এই মেয়েটি এখনো নিতান্তই বালিকা। তবে বেশী অনাবশ্যক লজ্জা সংকোচ নেই। খুব একটা লোভী বলেও মনে হয় না।

দেবব্রত একটু অবাক হয়ে বলল, কেন, তাতে কি হয়েছে?

এঃ মা, অত বড় ছেলে, এইটুকু প্যাণ্ট পরেছ, তার ওপর আবার ধ্যাড় ধ্যাড় করে রাস্তা দিয়ে দৌড়োচ্ছ সকলের চোখের সামনে, লজ্জা নেই?

দেবব্রত কিছুতেই লজ্জার কারণটা খুঁজে পেল না, বারবার নিজের নিম্নাঙ্গের দিকে তাকিয়ে দেখল, কোথাও অসঙ্গতি আছে কি না, তারপর মাথা নেড়ে বলল, না, আমি তো পোশাক পরেই আছি। আর দৌড়ের মধ্যে তো কোন দোষ নেই।

শিবানী একটু মিষ্টি করে হেসে বলল, সাত সকালে দৌড়োতে যে পাগল ছাড়া কার ইচ্ছে করে বাবা।

দেবব্রতর একটু রাগ হল। বলল, তোমরাই পাগল, কেবল ঝাল লঙ্কা খাবে আর সারাদিন শুয়ে আর বসে থাকবে।

একথায় শিবানী খুব হিঃ হি করে হেসে উঠল। বারবার বলতে লাগল, ঝাল লঙ্কা খাবে আর শুয়ে বসে থাকবে। হিঃ হিঃ।

কাল থেকে তুমিও যাবে আমার সঙ্গে।

কোথায়? দৌড়োতে?

না তো কী?

তোমার মতো পাগল কিনা।

তোমার শরীর খুব রোগা।

রোগাই ভাল। শীতকালে আমি ব্যাডমিণ্টন খেলি, জানো? রোগা বলে লবঙ্গ-লতিকা নই।

এখানে এসে অবধি অনেক নতুন শব্দ শুনছে দেবব্রত যেগুলোর মানে তার জানা নেই। মায়ের বা বাবার কাছে সে ভালই বাংলা

লিখতে পড়তে বা বলতে শিখেছে। কিন্তু তবু অনেক শব্দ তার অচেনা। লবঙ্গ-লতিকা শব্দটা যেমন। তবে মানে জিজ্ঞেস করলেই শিবানী পিছনে লাগবে বলে দেবব্রত আন্দাজে মানেটা ধরে নিল।

দোতলায় উঠতে উঠতে দেবব্রত বলল, হেলথ ভাল না থাকলে সবই বৃথা। বুঝলে?

তুমি বাপু হেল্‌থ হেল্‌থ করে আমাদের মাথা ধরিয়ে দিও না তো!

দোতলায় এসে বাথরুমে ঢুকে দেবব্রত স্নান করে নিল। বেশ ঝরঝরে লাগল তার।

তপোব্রত উঠেছেন। পাশের ঘরের ব্যালকনির কাছে ইজিচেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। কাগজ পড়া তাঁর বরাবরই প্রিয় অভ্যাস। ছেলের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তপোব্রত বললেন, তুই কবে ফিরে যাবি বলে ঠিক করেছিস?

দেবব্রত একটু ইতস্ততঃ করে বলল, এখনো ঠিক করিনি।

তপোব্রত কিছু একটা বলতে চাইলেন, কিন্তু বলতে গিয়েও বললেন না, সামান্যক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, খাওয়া দাওয়ার একটু অসুবিধে হচ্ছে বোধহয় তোর।

তা নয়, মাও তো আমাদের এরকমই রেঁধে খাওয়াত। তবে এরা একটু বেশী ঝাল খায়।

কথাটা ঠিক। দেবব্রতর মা কোনাদিনই সাহেবী খাবারের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর আমলে গরু বা শুয়োরের মাংস বাড়িতে ঢোকেনি। চীনে দোকান থেকে মশলা কিনতেন, দেশী রান্না রেঁধে খাওয়াতেন স্বামী-পুত্রদের। দেবব্রত বা শুভব্রত অবশ্য নিষিদ্ধ খাবার বাইরে খেয়ে আসত।

তপোব্রত বললেন, কিছু কিছু অসুবিধে তো হবেই। এখানে তোর বন্ধুও কেউ নেই, একেবারে নতুন দেশ। আমি বলি চারদিকটা একটু ঘুরে-টুরে দেখ। সাধুর তো পরীক্ষা হয়ে গেছে, ওকে নিয়ে দিন পনেরো কুড়ির জন্য টুরে বেরিয়ে যা। ভারতবর্ষে অনেক দেখার

জায়গা আছে। কেদার-বদ্রী, কন্যাকুমারী, কান্‌হা ফরেস্ট, রাজস্থান সব ঘুরে আয়। ভাল লাগবে। দেশটা ভাল করে দেখে চিনে নে, তারপর ইচ্ছে হলে ফিরে যাস। ফিরে যাওয়া তো শক্ত কিছু নয়। প্লেনে চেপে বসলেই হল।

দেবব্রত কিছু বলল না। দেশটা দেখতে তার আপত্তি নেই। তবে বাবা যদি ভেবে থাকেন যে, দেশ দেখলেই দেশের প্রতি তার ভালবাসা জন্মাবে তাহলে সেটা ভুল হবে। দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বা প্রাচীন ঐতিহ্য দিয়ে ভালবাসার বীজ অঙ্কুরিত করা যায় না। তার জন্য দরকার একটা আত্মীয়তার টান, রক্তের আকর্ষণ, প্রিয়জন। এখনো দেবব্রত কোনো প্রিয়জন দেখেনি।

শিবানী একটা অদ্ভুত নামে তাকে ডাকে। পুঁটুদা। পুঁটু তার নাম নয়। শিবানী কেন পুঁটুদা বলে ডাকে তার ব্যাখ্যাও করেনি। তবে এখন সে পাড়া জানিয়ে ডাকাডাকি করছে খাবার ঘর থেকে, পুঁটুদা, ও পুঁটুদা, খেতে এসো।

বুধোদের তরফেই তারা খাওয়া দাওয়া করছে কদিন। তবে এ ব্যবস্থা বেশী দিন চলবে না, আলাদা ব্যবস্থা করে নিতে হবে। তার জন্য চাই একজন রান্নার লোক, কাজের লোক এবং কিছু জিনিসপত্র। এদেশে বেজায় সস্তায় কাজের লোক পাওয়া যায় দেখে দেবব্রত খুবই অবাক হয়েছে। দেড়-দু'শ টাকায় অর্থাৎ মাসে মাত্র পনেরো বা কুড়ি ডলারে চব্বিশ ঘণ্টা কাজের লোক পাওয়া এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তবে বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য লোক এখনও পাওয়া যায়নি। খোঁজা হচ্ছে। পাওয়া গেলে তপোব্রত আর দেবব্রতর আলাদা খাওয়ার পালা।

শিবানীর ডাকে কোনো সাড়া না দিয়ে দেবব্রত নিঃশব্দে গিয়ে খাবার ঘরে ঢুকল। বলল, খুব চেঁচাতে পার।

টোস্ট ডিম সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে যে।

দেবব্রত একটা কথা মানতে বাধ্য, এদেশের সবজি, ডিম, পাঁউরুটির

স্বাদ আমেরিকার চেয়ে ভাল। মশলার জন্য এদেশের রান্নার স্বাদ একটু তীব্র বটে, কিন্তু খেতে খারাপ লাগে না।

শিবানী উল্টোদিকে বসে ড্যাবড্যাব করে তার খাওয়া দেখতে দেখতে বলল, রোজ ডিমসেদ্ধ খাও কি করে বল তো! আমার ভাল লাগে লঙ্কা কুচি দিয়ে ওমলেট।

তুমি খুব লঙ্কা খাও, না? সেইজন্যই এত রোগা।

আমি মোটেই রোগা নই।

দেবব্রত কথার পিঠে বেশী কথা বলতে অভ্যস্ত নয়। মুখচোরা না হলেও কথা বলতে সে বিশেষ ভালবাসে না। সে মৃদু একটু হাসি মুখে মাখিয়ে ডিমসিদ্ধ আর টোস্ট খেতে লাগল। সঙ্গে দুধ-চিনি ছাড়া গরম কফি।

টেবিলের আর একপ্রান্তে ছায়ার মতো এসে যে বসল তাকে দেবব্রত এ বাড়িতে এক আধবার দেখেছে। তবে কথা-বার্তা হয়নি। ছেলেটি তার খুড়তুতো ভাই। একমাত্র এর চেহারাটাই বেশ ছমছমে মেদহীন, টান টান। দেখে মনে হয়, শরীরকে বসিয়ে রাখে না।

দেবব্রত ভদ্রতার খাতিরে ছেলেটার দিকে চেয়ে একটু হাসল। ছেলেটা অবশ্য হাসল না। মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে একবার তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল। ছেলেটা কেমন তা দেবব্রত এখনো জানে না। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যেও সে লক্ষ্য করেছে যে, একে সবাই সমঝে চলে। ছেলেটার মুখে একটা কঠিনতা আর নিষ্ঠুরতা আছে।

শিবানী ওর সামনে এক কাপ চা রাখল। তারপর বলল, কখন বেরোবি?

কেন, কি দরকার?

রুটি হচ্ছে, খেয়ে যাস।

সে আমি বুঝব। যা করছিস কর।

শিবানী মুখটা গম্ভীর করে চলে গেল। একা ঘরে দেবব্রত আর তার ওই অদ্ভুত খুড়তুতো ভাই। একটা মাছি উড়ে উড়ে বসছে টেবিলে।

ছেলেটার সঙ্গে দেবব্রতর দু একটা কথা বলার ইচ্ছে হলেও চেপে গেল। তার মনে হল কথা বললে ছেলেটা তেড়িয়া জবাব দিয়ে বসবে। এ বাড়িতে সে আর তার বাবা খুব অভিপ্রেত নয়। তার ওপর এই ছেলেটা যেন একটু বেশী হোস্টাইল।

চা খেয়ে একটিও কথা না বলে ছেলেটা উঠে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পর মুহূর্তেই শিবানী ঘরে ঢুকে হাসিমুখে বলল, পুঁটুদা, গরম গরম আটার রুটি খাবে? আলুচচ্চড়ি দিয়ে!

দেবব্রত ব্রেকফাস্টটা ভালই খায়। মা বেঁচে থাকতে বাড়িতে হ্যাম বা বীফ ঢুকত না। বীফ এখনো ঢোকে না। তবে হ্যাম সে নিয়ে আসে। এখানে হ্যাম নেই, কমলালেবুর রস জুটছে না। খেতে তার একটু কষ্ট হয়। আটার রুটি সে অবশ্য অনেকবার খেয়েছে মায়ের হাতে। মন্দ নয়। বলল, দাও দুখানা।

শিবানী দৌড়ে গিয়ে নিয়ে এল।

দেবব্রত বলল, এই যে ছেলেটি বসেছিল, এর নামটা যেন কি!

বুড়ান। কেন বল তো? তোমার সঙ্গে আলাপ হয়নি?

হয়েছে বোধহয়। তবে ও বেশী কথা-টথা বলেনি।

ও ওইরকম।

কি রকম?

একটু বেশী গম্ভীর। বাড়িতেও থাকে না বড় একটা।

বুড়ান বোধহয় আমাকে পছন্দ করছে না।

ওর কথা বাদ দাও। দুনিয়ায় কাউকেই পছন্দ করে না।

সামথিং রং?

শিবানী ঠোঁট উল্টে বলল, কি জানি বাবা। এমনিতে তো সাতে

পাঁচে থাকে না। তবে ওর সঙ্গে সাবধানে মেশাই ভাল। বেশী ভাব করতে যেও না।

যে নিজে থেকে আগ্রহ দেখায় না তার সঙ্গে যেচে ভাব করতে যাব কেন ?

শিবানী একটু হেসে বলল, হ্যাঁ, তুমি তো আবার সাহেব। সাহেবরা শুনেছি ওইরকমই হয়।

সাহেবদের মধ্যেও নানারকম আছে। গায়ে পড়া সাহেব কি নেই ? তবে আমি আমার মতোই।

ঘরে বসে থাকা ব্যাপারটা দেবব্রতর কাছে অসহ্য। অমেরিকায় সে এ সময় চাকরিতে বেরিয়ে যায়। সাত আট ঘণ্টা ভূতের মতো খাটে। সোজা চলে যায় ক্লাবে। খেলে, জিমন্যাস্টিকস বা বক্সিং করে। ডিনারের পর প্রায়ই বন্ধুদের সঙ্গে কিছু না কিছু গানবাজনা শুনতে বা থিয়েটার দেখতে যায়। উইক এণ্ডে গাড়ি করে ঝড়ের গতিতে গিয়ে হয় পাহাড়ে চড়ে, না হয় সমুদ্রে সাঁতার কাটে, না হয় তো নতুন কিছু দেখে আসে। স্রেফ গাড়ি চালানোও তার প্রিয় অভ্যাস। এখানে এসে সে বিশেষ বেরোতে পারে না। একে তো গাড়ি নেই, কাজ নেই, এনগেজমেণ্ট নেই। তার ওপর রাস্তাঘাটও খুব আকর্ষণীয় নয়।

শিবানী, কোথায় যাওয়া যায় বল তো ?

সিনেমায় যাবে ? কাছে কোনো হল নেই। তবে লেক-এর ধারে মেনকায় একটা দারুণ ছবি হচ্ছে। নবীনাতেও নতুন বাংলা বই এসেছে।

দেবব্রত একটু নাক সিঁটকোলো। বলল, সিনেমা নয়। আমি জাস্ট একটু বেড়ানোর কথা বলছি।

ওমা, এই তো দৌড়ে এলে।

সে তো একসারসাইজ। এখন একটু মুভমেণ্ট দরকার। আমি একদম ঘরে বসে থাকতে পারি না।

ঠিক আছে, চল গড়িয়াহাটে নিয়ে যাব আজ তোমাকে।

সেখানে কি আছে ?

লোকজন, দোকানপাট।

আর কি ?

আবার কি থাকবে ?

গাছপালা, ফুল, নদী ?

সব কি এক জায়গায় চাও ? নদী দেখতে হলে গঙ্গার ধার, ফুল আলিপুর হর্টিকালচারে, গাছের জন্য বোটানিক্যাল গার্ডেন। না বাবা অত ঘোরা আমার পোষাবে না।

দেবব্রত হাসছিল। মেয়েটি ভারি মজার। বলল, ঠিক আছে, তোমার গড়িয়াহাটাতেই চল। বেশী দূর নয় তো ?

না, কাছেই। হেঁটেও যাওয়া যায়।

কখন যাবে ?

দশটা এগারোটায়। তার আগে দোকান খোলে না।

তাহলে আমি পাড়ার রাস্তা দিয়ে একটু ঘুরে আসি।

এস গিয়ে।

দেবব্রত উঠল। রাস্তায় বেরিয়ে চারপাশে একটু তাকাল। গায়ে গায়ে কেবল বাড়ি আর বাড়ি। কোথাও গাছপালার জন্য ছাড় রাখা হয়নি, পার্ক নেই, লন নেই, ঘাসজমি নেই। আত্মহত্যার আয়োজন ছাড়া একে আর কি বলা যায় ?

দেবব্রত খানিক দূর হেঁটে গেল আনমনে। একটা দেয়ালে ঘেরা মস্ত জায়গা দেখে সে দাঁড়াল। একটু অবাক হয়ে দেখল, দেয়ালে ঘেরা জায়গাটায় নিবিড় গাছপালা দেখা যাচ্ছে। কোনো উঁচু বাড়িও নেই।

আর একটু এগোতেই সে একটা নিচু ফটক দেখতে পেল। ফটকের ওপাশে ফুলের বন্যা। অনেক গাছপালা, হরিণও দেখল সে। আর একটা কুটির।

ফটকের কাছে গিয়ে সে খুব কৌতূহলের সঙ্গে ভিতরের বাগানটা দেখতে লাগল।

পিছন থেকে কে যেন মোলায়েম স্বরে জিজ্ঞেস করল, কাকে চাই?

দেবব্রত মুখ ফিরিয়ে দেখল, একটা কালোমতো ছেলে।

দেবব্রত বলল, বাগানটা দেখছিলাম। হরিণ আছে দেখছি।

তা আছে।

বাড়িটা কি আপনার?

না। আপনি এদিকে নতুন বুঝি?

হ্যাঁ।

তাই মালুম হচ্ছে। এখন কেটে পড়ুন। উঁকিঝুঁকি মারলে বিপদ আছে।

দেবব্রত ভারী অবাক হল। এমন সুন্দর একখানা বাগান তো দেখার জন্যই। বিপদ ঘটবে কেন?

সে বলল, বিপদ! বিপদ কিসের?

ছেলেটার মোলায়েম গলা হঠাৎ একটু তেড়িয়া হল। বলল, বিপদ অনেক রমক আছে। স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যেতে পারে। ফুটে পড়ুন।

ছেলেটার অনেক কথারই অর্থ দেবব্রত ধরতে পারল না। মালুম, ফুটে পড়ুন এ সব শব্দ সে শোনেনি। কিন্তু তাতে ছেলেটা কি বলতে চাইছে তা অনুমান করতে তার বেগ পেতে হল না। ছেলেটা রাফিয়ান গোছের, ঝগড়া করতে ভালবাসে।

দেবব্রত কয়েক সেকেণ্ড তার নিষ্পলক চোখ ছেলেটার চোখে রাখল। ছেলেটা তাকে হুমকি দিচ্ছে। কিন্তু কেন?

ছেলেটাও তার দিকে নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল।

পিছু হটতে হল দেবব্রতকেই। নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশ, কাজ কি ঘাঁটিয়ে? সে ভীতু নয়। কিন্তু সাহস দেখাবারও স্থান, কাল, পাত্র এবং পরিস্থিতি আছে।

ফিরে এসে সে শিবানীকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা ওই ওদিকে বাগানঘেরা একটা কুটির আছে, দেখেছ ?

দেখব না কেন ?

ওটা কার বাড়ি ?

যার বাড়িই হোক, ওদিকে বেশী যেও না।

তার মানে ?

ওটা যার বাড়ি সে সাঙ্ঘাতিক লোক।

দেবব্রত ইতস্ততঃ করে বলল, তাই হবে। আমি বাগানটা একটু দেখছিলাম, একটা রাফিয়ান ছেলে এসে আমাকে প্রায় ধমকাল।

ছেলেটার চেহারা কেমন ?

কালোমতো।

ডান দিকের কপালে একটা গোল চাকতির মতো দাগ আছে ?

দেবব্রত মাথা নেড়ে বলল, থাকতে পারে·· হ্যাঁ, আছে। তুমি চেনো ?

গুণ্ডা বদমাশ খুনেদের চেনার কোনো দরকার নেই আমার। তবে ও হচ্ছে গুলে। দত্তগুপ্তর চেলা।

গুলে ! গুলে আবার কেমন নাম ? এরকম নাম হয় নাকি ?

ওদের হয়। ওকে সবাই জানে ট্যারা গুলে বলে।

ট্যারা গুলে !

একটা চোখ ট্যারা। যাকগে, তোমাকে তেমন অপমান করেনি তো ?

কি জানি, বুঝতে পারছি না। তবে একটু অপমান তো বটেই। আমাকে ছেলেটা ওখান থেকে চলে যেতে বলল। সেটা কি অপমান হিসেবে নেব ?

শিবানী হাসছিল। বলল, অপমানের বোধটাও তোমার নেই। তবু যাহোক, যা বলবার মুখে বলেছে, গায়ে তো হাত দেয়নি।

তাও দেওয়ার কথা নাকি ? কিন্তু আমি তো কিছু অন্যায় করিনি।

করেছ। দত্ত গুপ্তের আস্তানায় উঁকি দেওয়া শুধু অন্যায় নয়, নিজের বিপদ ডেকে আনা।

দত্তগুপ্ত লোকটা কে?

মাফিয়া লিডার বোঝো?

বুঝব না কেন! দত্তগুপ্ত কি তাই?

অনেকটা তাই।

বুঝেছি। আমাকে বোধহয় ছেলেটা পুলিসের স্পাই ভেবেছিল।

তা হবে। বুড়ানকে বলে দেবোখন, ওরা কিছু করবে না তোমাকে।

বুড়ান! সে কি ওদের দলে?

শিবানী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল, তাই তো শুনি ওকে নিয়ে আমাদের যে কি দুর্ভাবনায় থাকতে হয় সব সময়, তুমি বুঝবে না। যাকগে, তুমি তৈরি হয়ে নাও, আমরা আর আধ ঘণ্টার মধ্যে বেরোব।

আমি তৈরী!

শিবানী সাজতে চলে গেলে দেবব্রত তার বাবার কাছে এল।

তপোব্রত মুখ তুলে বললেন, কোথায় যাচ্ছিস?

একটু ঘুরে আসি। তুমি এখানে এসে সব সময় চুপচাপ বসে থাকছ কেন?

তপোব্রত হাতের খবরের কাগজটা সরিয়ে রেখে বললেন, বিশ্রাম নেব ভেবেছিলাম। কিন্তু মনটা ভাল নেই।

কেন?

আছে কারণ। পারিবারিক ব্যাপার।

তাহলে ফিরে চল।

তপোব্রত মাথা নাড়লেন। ধীর স্বরে বললেন, অত সহজ নয় রে। সেখানেও তো মন টিকছিল না।

এখানে কি হল?

পারিবারিক ব্যাপার। এরা চাইছে বাড়িটা বিক্রি করে টাকা ভাগ করে নিতে। কোন মাড়োয়ারি নাকি অনেক টাকা দাম দিতে চাইছে।

ভালই তো। এ বাড়ি তো পুরোনো হয়ে গেছে।

তপোব্রত ক্লিষ্ট চোখে ছেলের দিকে চেয়ে বললেন, এ আমার পৈতৃক বাড়ি। অনেক স্মৃতি রয়েছে এ বাড়িতে! তার তো দাম হয় না। আমি বুধোকে বলেছি, বাড়িটা যদি আমিই কিনে নিই তাহলে কেমন হয়!

কি বলল?

বোধহয় রাজি নয়। দোনোমোনো করছে।

দেবব্রত এ সব সমস্যা নিয়ে ভাবতে রাজি নয়। এ বাড়িতে তার কোনো স্মৃতি নেই। এ দেশেই নেই। সে বলল, নিউ ইয়র্কে তুমি অনেক বেশী জোভিয়াল ছিলে। এখানে এসে কেমন মনমরা হয়ে গেছ।

তপোব্রত কিছু বললেন না। চুপ করে সামনের দেয়ালের দিকে চেয়ে রইলেন।

বাবাকে দেবব্রত তার নিজের মতো করে ভালবাসে। সেই ভালবাসার শিকড় মার্কিন সমাজে পুষ্ট হয়নি। হলে বয়োপ্রাপ্ত ছেলের সঙ্গে তার বাপের দূরত্ব সংঘটিত হত অনেক আগেই। বাবাকে একা এখানে রেখে ফিরে যেতেও দেবব্রতর ভাল লাগবে না। বাবা তাকে আশৈশব প্রভাবিত করেছে এক অদ্ভুত একরোখা স্নেহ আর প্রশ্রয় দিয়ে। আজও বাবাকে না জানিয়ে সে কোনো সিদ্ধান্ত নেয় না।

তপোব্রত জিজ্ঞেস করলেন, এ বাড়িতে সকলের সঙ্গে ভাব হয়েছে তোর?

না। শুধু বুধোদা, আর শিবানী।

সকলের সঙ্গে কথা-টথা বলিস। নইলে অহংকারী ভাববে।

বলতে তো চাই। কিন্তু এখানে দেখছি সকলেরই ভীষণ লজ্জা আর সংকোচ।

তোকে আগে কখনো দেখেনি তো, তাই।

শিবানী বাইরে থেকে ডাকল, পুঁটুদা, চল, আমি রেডি।

যাই বাবা।

এস গিয়ে। শিবানী সঙ্গে যাচ্ছে বুঝি? ভাল।

চার

চুরিটার ধরনই ছিল একটা চ্যালেঞ্জের মতো। দত্তগুপ্তর ভরসা এবং আশীর্বাদের রক্ষাকবচেও তার এলাকায় এবং তার নাকের ডগায় এরকম ঘটনা ঘটে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। তবে একাজ কে করেছে তা আমরা জলের মতো পরিষ্কার বুঝতে পেরে গিয়েছিলাম।

চুরির চেয়েও বড় কথা দারোয়ানকে ওরকম মার। হাসপাতালে লোকটাকে নিয়ে যমে মানুষে টানাটানি হয়েছিল। মাথার জখমটা খুবই খারাপ ধরনের।

দত্তগুপ্ত সবই ভাবলেশহীন মুখে শুনল, হুঁ হাঁ কিছু করল না। নান্নুকে দেখা যাচ্ছিল না সেই ঘটনার পর থেকে। সাত দিন বাদে নান্নুর খবর পাওয়া গেল। অন্য দল করেছে।

বলতে কি নান্নুকে আমার হিংসেই হয়েছিল। দত্তগুপ্তর তাঁবেদার না থেকে সে অন্য দলের নেতা হয়েছে এটা কম কথা নয়।

শুধু নেতা হওয়া বা দল করাই নয়, নান্নু লাইনের ওধারে দত্তগুপ্তর একটা এলাকা দখলও করে নিল। যেখানে ব্যাপারী, দোকানি, ঠিকাদারদের কাছে দত্তগুপ্ত তোলা পেত, সেখানে নান্নু তোলা আদায় শুরু করে দিল।

দত্তগুপ্ত আমাকে একদিন দুপুরে তার তপোবনের ঘরে বসে বলল, নান্নুর পিছনে কে আছে কিছু জানিস?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না।

দত্তগুপ্ত কিছুক্ষণ উদাস চোখে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, এইটুকু থেকে মানুষ করেছি।

কথাটা খুব মিথ্যে নয়। নান্নু যখন দত্তগুপ্তর হাতে এসে পড়ে তখন সে নিতান্তই দশ বারো বছরের ছেলে। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল ও বাড়ির চাকর। দেশ চব্বিশ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলে। নান্নুর আর একটু কৃতজ্ঞতাবোধ থাকা উচিত ছিল। বিশেষ করে সামান্য একটা ঘটনা থেকে এত বড় বিদ্রোহ ঘটানোর কারণ তো ছিল না।

দত্তগুপ্ত আমার দিকে চেয়েছিল, পলকহীন চোখে। খুব মোলায়েম গলায় বলল, তোরা খুব বন্ধু ছিলি, না?

ছিলাম।

দত্তগুপ্ত আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, যাকগে, তোকে একটা কাজ দিচ্ছি। ওই যে ফ্ল্যাটবাড়ি, যা নিয়ে এত ঝামেলা, ওটা একটু নজরে রাখিস। যারা করছে তারা পয়সাওলা লোক। তারা থাকলে পাড়ার ভাল হবে, ইজ্জত বাড়বে। যদি হাঙ্গামা হুজ্জত ফের হয় তবে তারা ফ্ল্যাট বেচে কেটে পড়বে। আমি তা চাই না। বুঝেছিস?

পাহারা দিতে হবে নাকি?

অন্ততঃ নজর রাখিস। তোরা চার পাঁচজন পালা করে ঘুরলেই হবে।

আচ্ছা।

আর গুলে নামে একটা নতুন ছেলে এসেছে। দেখেছিস?

দেখেছি।

কেমন মনে হয়?

নেড়েচেড়ে দেখিনি।

একটু কাঁচা আছে। তালিম দিস। রোখ থাকলে উঠে যাবে ওপরে।

দেখব।

আমরা বাড়িটার ওপর নজর রাখতাম বলেই কি না কে জানে, নাগ্ন বা আর কেউ কোনো হামলা করল না। বাড়িটা ধা ধা করে উঠে গেল। পেল্লায় বাড়ি, বিশাল বিশাল সব ফ্ল্যাট এবং তার ভিতরে মার্বেল থেকে শুরু করে হেন দামী জিনিস নেই যা বসানো হল না। প্রত্যেকটা ফ্ল্যাট ডুপ্লেক্স এবং আলাদা মনোহারী সিঁড়ি দিয়ে যোগাযোগ। কানাঘুষো শুনলাম দুই আর তিনতলার পূর্ব-দক্ষিণ ফ্ল্যাটটা দত্তগুপ্ত কিনেছে। কবে কিনল, কিভাবে কিনল তা আমরা জানি না। তবে সঠিক দামে বা সাদা টাকায় নিশ্চয়ই নয় এবং দত্তগুপ্ত ওটাতে থাকবেও না। হয় চড়া রেটে ভাড়া দেবে, নয়তো অন্য কাজে লাগবে।

নিজের মুখে বলতে নেই, আমার চেহারাখানা ভাল। একসময়ে ওয়েট লিফ্‌টিং করতাম। বেশ লম্বাও আমি—পাঁচ দশ। রং বেশ ফর্সা বললে ভুল হয় না। বি. কম. পাসও করেছি। সব মিলিয়ে যাকে ব্যাকগ্রাউণ্ড বলে তা আমার খুব একটা অনুজ্জ্বল নয়। তাই রুমকির সঙ্গে আমার প্রথম মোলাকাতটা হিন্দি সিনেমার ধার ঘেঁষেই গেল।

ফ্ল্যাটবাড়িটা দেখতে এসেছিল রুমকি। তাদের ফ্ল্যাটও দুই আর তিনতলা জুড়ে, তবে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, ফ্ল্যাট দেখে যখন নেমে আসছে তখন সিঁড়ির নিচে আমার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা।

আপনিই কি মৌলি?

আমি একটু থমকে গিয়ে বললাম, কে বলল?

দত্তগুপ্তদাই বলেছিলেন, মৌলি নামে একজন বাড়িটা গার্ড দিচ্ছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই।

দত্তগুপ্ত আমার সম্পর্কে আরও কিছু বলে থাকবে ওকে। বেশ প্রশংসায় ভরা চোখে আমাকে দেখল রুমকি। তবে সে দৃষ্টির মধ্যে প্রেম-টেম ছিল না আদপেই। আমি যে ভাল পাহারাদার সেই স্বীকৃতিটুকু দিল। গাড়ি পর্যন্ত রুমকিকে এগিয়ে দিলাম।

রুমকি বলল, কে একটা ছেলে নাকি আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করছে। যে জামাইবাবুর কাছে টাকাও চেয়েছিল অনেক। তাকে চেনেন?

একটু হাসলাম, চিনে আর কি লাভ? সে তো আর এ পাড়ায় ঢুকছে না।

কিন্তু আমরা হাঙ্গামাকে ভয় পাই। এ পাড়াটা তেমন ভালও নয় শুনেছি।

কোনো পাড়াই ভাল নয়। তবে ভদ্রলোকরা আসতে থাকলে ধীরে ধীরে ভাল হয়ে যাবে।

আমার বাবা হার্ট পেশেণ্ট, তাঁর জন্যই ভয়।

আমি ভরসা দিয়ে বললাম, যতটা লোকে রটায় ততটা কিছু নয়। দত্তগুপ্তদার এলাকায় ছুটছাট হাঙ্গামা হয় না।

রুমকি গাড়িতে উঠবার আগে আমাকে আর একটু ভাল করে দেখে নিল। একটু হাসি উপহার দিল। চলে গেল।

তবে ঘন ঘন আসতে লাগল এর পর থেকে। আলাপ জমে যেতে লাগল। জেনে ফেললাম, রুমকি একটা বিউটি পার্লার চালায়। সেই সঙ্গে একটা এক্সক্লুসিভ শাড়ির কারবার। বেশ ভাল ব্যবসা, প্রচুর রোজগার। তার বাবার অবস্থাও ভাল। একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, দু হাতে লুটেছেন, টাকা-পয়সার হিসেব বা আয়ের ধরন অবশ্য রুমকি বলে নি। আমারই আন্দাজ।

রুমকিকে আমার ভাল লেগেছিল তার প্রচণ্ড পরিশ্রমে আগ্রহ দেখে। দু দুটো কারবার সামলাতে হিমসিম খাওয়ার কথা। কনে-খোঁপা বাঁধা থেকে মেয়েদের পায়ে পেডিকিওর করা পর্যন্ত সৌন্দর্যচর্চার নানা মন্ত্রগুপ্তি তাকে মেহনত করে শিখতে হয়েছে। তার ওপর শাড়িতে রকমারি নকশা ফেলে সুতোর বুনোট তোলাও উঁচু পর্যায়ের শিল্প এবং প্রচণ্ড শ্রমসাধ্য। তার বেশ কয়েকজন সহকারিণী আছে অবশ্য। কিন্তু গোটা ব্যাপারটাই তাকে দেখতে হয়।

রুমকির সঙ্গে তুলনায় আমি ফেকলু পার্টি। আমার রোজগারের

ধরনটাই আত্ম-অবমাননাকর। দু বেলা একটা ভণ্ড, লোভী, বিবেকহীন, হিংস্র, মুখোশধারী লোককে সেলাম বাজাতে হয়। তার হুকুমে সাদাকে কালো, নয়কে হয় করে বেড়াতে হয়। আমার রোজগারে সৃষ্টি নেই, সেবা নেই, গৌরব নেই, আত্মনির্ভরশীলতা নেই, নিশ্চয়তা নেই, নিরাপত্তা নেই।

রুমকিকে তবু হিংসে হল না, শ্রদ্ধা হল। জিনিসটা আমার মধ্যে প্রায় ছিলই না। এই প্রথম হল।

রুমকিরা ফ্ল্যাটবাড়ির দখল নিল, ফটকে দারোয়ান ইত্যাদি মোতায়েন হয়ে গেল। আমার ডিউটি শেষ হল। কিন্তু রুমকি আমাকে উপেক্ষা করে নি। সে কাজ-করা মেয়ে, পাঁচজনের সঙ্গে মিশতে হয়। পুরুষ সম্পর্কে তার রোম্যানটিক ভাব-টাব নেই। অকারণ লজ্জাও নেই। সে আমাকে তার ফ্ল্যাটে যেতে বলেছিল চা খেতে।

বাড়িতে রুমকির বাবা আর মা ছাড়া কেউ ছিল না। রুমকির তিন দাদা আছে, পৈতৃক বাড়ি আছে বেলেঘাটায়। সেই দাদা আর বউদের সঙ্গে প্রবল অবনিবনা চলছিল তার মা আর বাবার। রুমকি ফ্ল্যাট কিনে, দাদাদের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মা-বাবাকে ভিন্ন করে এনেছে। এ যুগে যথেষ্ট সাহসিকতার কাজ।

রুমকি চা-এর নেমন্তন্নে ডেকে গোটা কাহিনীটা আমাকে শোনাল, তারপর বলল, পুরুষগুলো আজকাল যে কি যাচ্ছেতাই হয়ে যাচ্ছে!

আমার নিজের বাড়িতেও এরকম সব সমস্যা আছে। তাই আমাকে স্বীকার করতে হল যে, রুমকি মিথ্যে বলে নি।

রুমকি বলল, সারাদিন আমি বাড়ি থাকি না। সকাল থেকে রাত অবধি আমার দম ফেলার সময় থাকে না। এ বাড়িতে এখনো ফোনটা আসেনি। আপনি আমার বুড়ো মা-বাবার একটু খোঁজ-খবর নেবেন রোজ?

নেব, চিন্তা করবেন না।

কাজের লোক অবশ্য আছে, কিন্তু এদের তো বিশ্বাস নেই। একা বাড়িতে খুন-টুন করার ঘটনাও তো ঘটেছে।

একটু হেসে বললাম, অত ভাববেন না। আমরা যখন আছি তখন ওসব কিছু হবে না।

রুমকিই তার গাড়ি করে একদিন তার বিউটি পার্লার আর শাড়ির শিল্প-কেন্দ্র দেখাতে নিয়ে গেল। বেশ অভিজাত চেহারার সাজসজ্জা। দেখে মুগ্ধ হতে হয়।

রুমকি সব দেখাতে দেখাতে বলল, বিয়ের কনের খোঁপা বাঁধতে আমরা আড়াইশো টাকা নিই বলে আমাদের ডাকাত ভাবে। কিন্তু ম্যানুয়েল লেবার আর আর্টিস্টিক টাচেরও যে একটা দাম আছে সেটা এদেশের লোক বোঝেই না।

আমি হেসে বললাম, আজকাল বুঝছে।

হ্যাঁ, একটু একটু বুঝছে, কদর দিচ্ছে, নইলে আমার ব্যবসা লাটে উঠত।

তখন সকালবেলা। দোকানে খদ্দের আসতে শুরু করেনি। রুমকি, আমি আর তার দুজন অ্যাসিস্ট্যান্ট মেয়ে বসে চা খেতে খেতে টুকটাক কথা বলছিলাম। রুমকি চা শেষ করে কাপটা রেখে হঠাৎ আপনি থেকে তুমিতে নেমে আমাকে বলল, এই ওঠ তো, তোমার ওপর একটা এক্সপেরিমেণ্ট করি।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কিসের এক্সপেরিমেণ্ট ?

তোমার চেহারায় সিলভেস্টার স্ট্যালোনের আদল আছে। সেটাকে প্রমিনেণ্ট করা যায় কিনা দেখি। এই নিনা, ওর চুলগুলোকে ট্রিম কর তো।

তিনটে মেয়ের হাতে সেদিন আমাকে বিস্তর নাকাল হতে হয়েছিল। ভ্রূ পর্যন্ত প্লাক করেছিল ওরা। সাধের গোঁফ উড়ে গেল। বিস্তর পলেস্তারা পড়ল মুখে। তবু সবটাই সয়ে গেল রুমকির বার বার তুমি উচ্চারণে।

সেই দিন থেকে তুমি।

পরস্পরকে দেখলে উজ্জ্বল এবং খুশি হয়ে ওঠারও শুরু সেই দিন।

মাস দুই বাদে রুমকি আমাকে বলল, শোনো, আমার তো একজন পুরুষ পার্টনার দরকারই। তুমি যদি জয়েন কর বেশ হয়। বাইরের দৌড়ঝাঁপ, হিসেবপত্র রাখা মার্কেটিং, এ সব আমি আর একা পেরে উঠছি না। আমি আর্টটুকু নিয়ে থাকতে পারলে বাঁচি। কমার্সটা যদি তুমি দেখ।

চমৎকার প্রস্তাব। আমি একটু হেসে বললাম, শুধু ব্যবসার পার্টনার? লাইফের পার্টনার দরকার নেই বুঝি?

রুমকি লাজুক নয়। সেও বলল, এটা হয়তো ওটারই ট্রায়াল। দেখবে লক্ষ্মীটি?

একটি ভদ্র, সুন্দর, স্থিতিশীল জীবনের চৌকাঠে তখন আমার পা ঢুকে পড়তে যাচ্ছি।

সেই সময় দত্তগুপ্ত আমাকে ডেকে পাঠাল।

বললাম, কি ব্যাপার দত্তগুপ্তদা?

দত্তগুপ্ত বেলের সরবৎ খেয়ে মুখ মুছে বলল, নান্নু।

কি করেছে?

তুই আজকাল পাড়ার খবর রাখিস না। কি হয়েছে তোর?

আমার কি হয়েছে সে কথা দত্তগুপ্ত কিছু কম জানে না। চারদিবে তার চর, সর্বত্র তার চোখ। আমার কি হয়েছে তা আমি যতটুকু জানি দত্তগুপ্তও ততটাই জানে। কাজেই মিথ্যে কথা না বলে চুপ করে রইলাম।

দত্তগুপ্ত বাগানে জল দিতে যাওয়ার জন্যে উঠে ঝারি হাতে নিয়ে মৃদুস্বরে বলল, এলিমিনেট নান্নু।

ব্যস, ওই অবধি। আর কোনো কথা নয়।

কি একটা আপত্তি জানাতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ চোখ পড়ল গুলে দিকে। দরজার কাছে সে দাঁড়িয়ে, হাতে নাঙ্গা পিস্তল। এ সময়ে

ঘরে তার হাতে পিস্তল থাকার কথা নয়। কেন আছে তা বুঝে নিতে আমার দেরি হল না। ওয়ার্নিং, হুঁশিয়ারি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কবে ফিনিশ করতে হবে কাজটা?

গুলে জবাব দিল, আজই।

নান্নুর খবর আমি না রেখেও রাখতাম। সে উঠে পড়ে লেগেছিল তার গড ফাদারের জায়গাটা নিতে। দত্তগুপ্তর মতো বুদ্ধি, মেজাজ, ব্যক্তিত্ব ও বিবেচনার শতকরা পঞ্চাশ ভাগও নান্নুর ছিল না। কিন্তু রোখ ছিল, গাটস ছিল। দত্তগুপ্তের বেশ কিছু এলাকা দখল করে নিয়েছে সে, দল ভাঙিয়েছে। সম্প্রতি ছুটো চোলাইয়ের ব্যবসা তার হাতে চলে গেছে।

রুমকির সঙ্গে যখন আমার জীবন মিশে যেতে চলেছে তখনই এই খুনখারাপি করার ইচ্ছে আমার বিন্দুমাত্র ছিল না। কিন্তু এও জানি, আমার ভবিষ্যৎ বলে যদি কিছু থাকে তবে তা দত্তগুপ্তের হাতে। সে যদি চটে তবে রুমকিও যাবে, প্রাণও যাবে। দত্তগুপ্তর সঙ্গে তর্ক করে বা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। সব জেনেশুনেই সে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নান্নুকে মারা বড় সহজ কাজও ছিল না। তার দেহরক্ষী বাহিনীরা সম্ভাব্য আক্রমণের সম্ভাবনায় তাকে ঘিরে রাখে। অগ্রিম খবর দিয়ে নান্নু কোথাও যায় না, এমন কি রোজ এক দোকানে সে চা খায় না, একই দোকানে বসে মদ্যপান করে না, এমন কি প্রতিদিন সে এক মেয়েছেলের সঙ্গেও শোয় না। দত্তগুপ্তর সঙ্গে শত্রুতায় নামবার পর থেকে সে দশ গুণ সাবধান হয়েছে। সুতরাং তার এলাকায় তার কেশাগ্রও স্পর্শ করা অসম্ভব। করতে গেলে পুরো দল নিয়ে মুখোমুখি ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। কিন্তু দত্তগুপ্ত প্রকাশ্যে যুদ্ধের বিরুদ্ধে। সে এলাকাকে খামোখা চমক দিতে চায় না। সে চায় নিঃশব্দে কার্যোদ্ধার!

খবর ছিল নান্নুর এক দোস্ত খিদিরপুরে একখানা ঝিনচাক

রেস্টুরেন্ট খুলছে। দেদার পয়সা খরচ। রেস্টুরেন্টে 'বার' থাকবে, নাচনেওয়ালী, গানেওয়ালী থাকবে। দোস্ত খুব মালদার। রেস্টুরেন্ট ওপেন হচ্ছে বলে স্টেটসম্যানে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। প্রথম দিন খানাপিনায় রিবেট আছে।

বলা বাহুল্য সেই ওপেনিং সেরিমনিতে নান্নু যাবে সদলবলে। অবশ্য দলবল বেশী নিশ্চয় যাবে না, কারণ সকলের তো নেমন্তন্ন হতে পারে না। নান্নুর সঙ্গে জোর দু তিনজন যাবে। তাদের আর্মস থাকবে অবশ্য। আর খিদিরপুর আমাদের এলাকা থেকে অনেক দূরে বলে সেখানে নান্নুর তেমন ভয়ও নেই।

এসব খবর দত্তগুপ্ত খুব নিখুঁত ভাবে নিয়েছিল।

ওই রেস্টুরেন্টেই নান্নুর কবর খুঁড়তে হবে।

আমাদের হাতে একটা ট্যাক্সি ছিল। কাজে লাগানো হত প্রয়োজনমতো। নম্বরপ্লেট পাল্টে সেটা নিয়ে আমরা সেই রেস্টুরেন্টের কাছাকাছি পার্ক করে অপেক্ষা করতে লাগলাম। টুনি বাল্ব, মারকারি ভেপার ল্যাম্প আর গ্যাঁদার মালায় খুব সাজানো হয়েছে রেস্টুরেন্টটাকে। স্টিরিও সিস্টেমে তুরন্ত সব গান বাজানো হচ্ছিল। ভিতরে বেশ মৃদুমন্দ আলোর ব্যবস্থা। লোকজনও হয়েছিল মন্দ নয়। রেস্টুরেন্টের নামটাও বাহারী। ডিসকোথেক। বার অ্যাণ্ড বাইট।

নান্নু যখন এসে ট্যাক্সি থেকে নামল তখন ডিসকোথেক ঝিমিয়ে গেছে। খদ্দের প্রায় নেই, বুঝলাম বেশী রাতেরই নেমন্তন্ন। সারা রাত হাল্লাগুল্লা চলবে।

আমরা নান্নুকে ঘণ্টা দেড়েক সময় দিলাম। দত্তগুপ্তর তাই নির্দেশ ছিল। নান্নু মাল টানতে শুরু করলে সম্পূর্ণ বেহেড না হওয়া পর্যন্ত টেনেই যাবে। অতি দ্রুত খায় সে। তাই ওই দেড় ঘণ্টার নিরাপদ ছাড়।

সাড়ে এগারোটায় আমি আর গুলে গাড়ি থেকে নেমে চটপট পায়ে গিয়ে রেস্টুরেন্টের সাজানো দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লাম। বিরাট

বড় একটা হলঘর। কয়েকজন বেয়ারা সাফাই করছে। কেউ নেই।

একজন সপ্রশ্ন চোখে তাকাতেই হেসে বললাম, সিন্‌হাবাবু কোথায়? আমাদের আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে।

লোকটা মালিকের বন্ধু ভেবে আমাদের ভিতর দিকে নিয়ে গিয়ে একখানা ছোট ঘর দেখিয়ে দিল। দরজায় প্লাস্টিকের অক্ষরে লেখা —ম্যানেজার। দরজা বন্ধ। ভিতরে খুব জোর হল্লার শব্দ।

দরজা খুলে ভিতরে পা দিয়েই আমি পিস্তল তুললাম। বাঁ দিকে নান্নু বসে। মাথা তোলার মতো অবস্থাও নয়।

দুটো গুলি চালিয়ে দরজাটি বন্ধ করে সটান দৌড়।

ট্যাক্সিটা সামনে চলে এল সাঁ করে। উঠতেই ছেড়ে দিল উল্কার বেগে।

বস্তুতঃ এত পরিষ্কার কাজ আমি আগে কখনো করিনি। চমৎকার এবং নিখুঁত।

সারা রাত্রি অবশ্য ঘুম হল না। বসন্ত রাত্রির হিম-হিম আবহাওয়াতেও বার দুই স্নান করতে হল। সিগারেট পোড়ালাম অনেক। একটু ব্রাণ্ডি খেতে হল। তবু মনে হচ্ছিল, কোথাও খুঁত রেখে আসিনি ত! আমার মুখে দাড়ি গোঁফ লাগানো ছিল, মাথায় ছিল পরচুলা। পরে আইডেনটিফিকেশনে সাক্ষীরা বুড়বক বনবেই।

পরদিন দত্তগুপ্ত সব শুনে উদাস চোখে চেয়ে রইল দূরের দিকে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এইটুকু বয়স থেকে বড় করেছিলাম নান্নুকে। কত বড় হতে পারত। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, খুব ভাল অপারেশন করেছিস। তোর হবে।

দত্তগুপ্তদা, একটা কথা বলব?

বল।

আমাকে ছেড়ে দিন। আমি অন্য কাজে নামব।

দত্তগুপ্ত ফের উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তারপর বলল, সবাই আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে আজকাল। কেন রে ?

বললাম তো, অন্য একটা কাজে নামব। এ লাইন ছেড়ে দেব।

বড়লোক হতে চাস তো ! জানি।

বড়লোক নয়, ভদ্রলোক।

কথাটা হয়তো স্পর্ধার মতো শোনাল। দত্তগুপ্ত একবার তাকাল আমার দিকে। ওই স্থির অচঞ্চল চোখ দেখে মনের ভাব কোনোদিনই বোঝা যায় না। একটা দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দ করে দত্তগুপ্ত বলল, তোর যা ভাল মনে হয় করবি।

খুনটা করার পর থেকেই আমার ভিতরটা খুব অস্থির। নান্ন বেইমানী করে থাকলে তা দত্তগুপ্তের সঙ্গে করেছে, আমার সঙ্গে তো নয়। আমার সঙ্গে তার একরকম দোস্তিই ছিল এককালে। সেটাও একটা কারণ। আর একটা কারণ রুমকি। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে একটা সুন্দর মেয়ে কেমন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, কেমন লড়াই করছে সব বিরুদ্ধতার সঙ্গে ! এমন সতেজ একটা প্রাণশক্তিওয়ালা মেয়ের সঙ্গ পেয়ে আমার মন থেকেই মারদাঙ্গা, খুনখারাপির ইচ্ছে উবে গিয়েছিল। এই খুনটা আমাকে তাই ভিতরে ভিতরে অস্থির করে তুলল।

পাঁচ দিন বাদে যখন রুমকির সঙ্গে তার শাড়ির সেল্‌স কাউন্টারে দেখা করলাম সে অত ব্যস্ততার মধ্যেও আমার মুখ দেখে স্থির চোখে চেয়ে থেকে বলল, কি হয়েছে বল তো !

শরীর খারাপ ছিল।

খারাপ তো হবেই। সারাদিন রোদে জলে ঘুরে বেড়াও, হবে না ! কি হয়েছিল ?

জ্বর সর্দি।

বোস ! একটা চেয়ার খুঁজে নাও তো। চারদিকে সব জিনিস ডাই হয়ে রয়েছে।

বাস্তবিকই রুমকির কারখানায় এক পাগলের মত অবস্থা। হাজারো অর্ডার এবং সকলেরই তাড়া। এমব্রডয়ারি, কাঁথা ফোঁড়ের নকশা, বিচিত্র সব আয়না আর পুঁতি বসানো সুতোর কাজ, বাটিক, বুটি, ছাপা, চিকন—শিল্পকলার আর শেষ নেই। অন্ততঃ সাত আটজন মেয়ে দুই শিফ্‌টে সারা বছর অক্লান্ত কাজ করছে। সবচেয়ে বেশী ধকল অবশ্য রুমকির।

অনেকক্ষণ রুমকি আর কথা বলতে পারল না আমার সঙ্গে। এক বড়লোক খদ্দেরকে বিদায় করল। তারপর ঘরের কোণে হিটারে চা করে নিয়ে এল নিজের ও আমার জন্য। টি ব্রেক তার।

বলল, পাড়ায় কি সব গণ্ডগোল হয়েছে বল তো!

কিসের গণ্ডগোল?

নান্নু না কে একজন খুন হয়েছে!

আমি চোখ নামিয়ে বললাম, হ্যাঁ।

সে কি তোমার বন্ধু ছিল?

মাথা নেড়ে বললাম, একসময়ে ছিল।

রুমকি বুদ্ধিমতী মেয়ে। প্রসঙ্গটা আর খোঁচাল না। বলল, তোমার জন্য পথ চেয়ে আছি। কবে আমার ব্যবসাটা একটু দেখতে শুরু করবে বল তো!

শুরু করব বলেই তো আজ আসা।

বাঁচলাম বাবা। একজন পুরুষ মানুষ না থাকলে যে কত অসুবিধে। জামাইবাবুর সময় নেই, দাদারা অন্যরকম, সবটাই আমার নিজের হাতে করতে হয়েছে। আর পারছি না। সবচেয়ে কোন্‌টা খারাপ লাগে জানো? বেশী রাতে একা বাড়ি ফেরা। তখন শরীর আর নেয় না। মনটা ভীষণ ফাঁকা লাগে। জামাইবাবুর গাড়িটা মাঝে মাঝে ধার করি বটে, কিন্তু এবার নিজেকে একটা কিনতে হবে।

কেনো রুমকি, তোমার গাড়ি দরকার। আমাকে চালাতে শিখিয়ে দিও, আমি রোজ রাতে তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

রুমকি অর্থপূর্ণ একটু হেসে বলল, তুমি ছাড়া আর কে নেবে? কে আছে আর!

না, রুমকির সঙ্গে আমার মাংসল প্রেম ছিল না। যা ছিল তা এক অদ্ভুত কাজ, সমঝোতা, সহানুভূতির সলিড ভিতের ওপর গড়া সম্পর্ক।

সেদিন সারাক্ষণ রুমকির কাছাকাছি রইলাম। তার হিসেবপত্র ঠিক করলাম। কয়েকটা চিঠিপত্রের জবাব দিলাম। দুপুরে দুজনে গিয়ে একটা ভাল রেস্তরাঁয় খাওয়া সেরে অনেক রাত অবধি একসঙ্গে নানা কাজ করতে করতে এক বুকভরা আনন্দকে টের পাচ্ছিলাম।

ফিরলামও দুজনে একসঙ্গে। ট্যাক্সিতে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে পরস্পরকে অনুভব করতে করতে! আমাদের জীবনের মিলিত স্রোত লক্ষ্যাভিমুখী হয়ে উঠেছিল।

সব দুধ ছানা কেটে গেল রুমকিকে পৌঁছে দিয়ে এসে নিজের বাড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। বাড়িতে পুলিস অপেক্ষা করছিল। খুব নিঃশব্দে এবং প্রায় ভদ্রভাবেই তারা আমাকে তুলে নিয়ে গেল থানায়।

নেওয়ার কথা নয়। থানা দত্তগুপ্তর হাতের মুঠোয়। তবু যে নিল তাতে বুঝলাম, দত্তগুপ্তর সায় তো আছেই, হয়তো ইশারাও আছে। নান্নু গেছে, মৌলিও যাক। দত্তগুপ্ত কাউকেই বেশীদিন রাখে না। যারা তার বিবিধ দুর্বলতা বা রন্ধ্রের কথা জেনে যায় তারা ক্রমশঃই হয়ে ওঠে বিপজ্জনক।

ভেবে দেখতে গেলে একরকম ভালই হয়েছিল। গ্রেফতার না হলে, আমার ধারণা দত্তগুপ্ত আমার পিছনে গুলে বা অন্য কাউকে লাগাত। পিছন থেকে মারত তারা।

তার পরের কাহিনী অত্যন্ত সাদামাটা। যেমনটা হয় আর কি। আমার ভালরকম ক্যামোফ্লেজ থাকা সত্ত্বেও আইডেন্টিফিকেশন প্যারেডে অন্ততঃ চারজন চাক্ষুষ সাক্ষী আমাকে সনাক্ত করল। আমার সঙ্গে যে গুলে ছিল সে প্রসঙ্গ একবারও উঠল না। আমার পক্ষে একজন উকিল

দত্তগুপ্ত ভদ্রতার খাতিরে লাগিয়েছিল বটে, কিন্তু সে প্রথম থেকেই উল্টোপাল্টা জেরা করে কেস আরও খারাপ করে দিল।

খুনের চার্জ হলেও শেষ অবধি জজসাহেব বোধহয় একটা কিছু গন্ধ পেয়েছিলেন। আমার চেহারা, হাবভাব, উত্তেজনাহীন হতাশাগ্রস্ত মুখ তাঁকে প্রভাবিত করে থাকবে। খুনের তেমন জোরালো প্রমাণ দাখিল হয়েছে বলে তিনি মনে করলেন না। সাজা অবশ্য হল।

সেটা কথা নয়। কথা হল, থানা বা আদালতে রুমকি একবারও আসেনি। আমার মেয়াদ হওয়ার পরও নয়। রুমকি নিজেকে মুছে নিল আমার জীবন থেকে।

কয়েকটা বছর জেলখানায় কাটল হতাশা থেকে গভীরতর হতাশায় ডুবে যেতে যেতে। মা নেই, বাবা বা ভাইবোনদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভাল ছিল না কোনোদিনই। আমার ভাল জাতের বন্ধুরা বহুকাল আগে আমাকে ছেড়ে গেছে। ছিল শুধু রুমকি।

জেল থেকে বেরিয়েছি মাত্র কয়েকদিন। লজ্জার মাথা খেয়ে ফিরতে হয়েছে সেই পুরোনো পাড়ায় এবং বাড়ির অনভিপ্রেত পরিবেশে। আমার প্রত্যাগমনে কেউ খুশি হয়নি। বেজার মুখে মেনে নিয়েছে মাত্র। মেয়াদ ফুরোনোর অনেক আগেই ছাড়া পেয়ে গেছি প্যারোল পেয়ে পেয়ে। জেলখানায় খুব ভাল ছেলে হয়ে ছিলাম। নিস্তেজ, হতাশ, ভেঙে পড়া। ওরা দয়া করে ছেড়ে দিয়েছে।

বাড়িতে ফিরে কয়েকদিন চুপচাপ ঘরে বসে ভাবলাম, আমার কতটা আর অবশিষ্ট আছে, এবং সেই অবশিষ্ট আমিটাকে দিয়ে আর কতটুকু কি করা যেতে পারে। মনে হল, আমি তলানীতে ঠেকে গেছি। আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই।

বহুদিন বাদে আজ রুমকিকে দেখলাম।

রুমকি মাংস কিনছে। আমার মনে হল, মাংসের দোকানে মাংস। মাংসের সামনে মাংস। মাংসই কিনে নিচ্ছে আর এক মাংসকে।

কিন্তু এরকম বীভৎস কথা আমার মনে হল কেন? রুমকি তো

কোনোদিনই আমার কাছে মাংস ছিল না। ওভাবে ভাবিইনি কখনো ওকে। তবে?

জেলখানা আমার কতখানি কেড়ে নিয়েছে কতদূর নষ্ট করেছে আমাকে ভেবে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

পাঁচ

এই কি তোমাদের গড়িয়াহাটা?

কেন, খারাপ লাগছে?

দেবব্রত মৃদু হেসে বলল, তা নয়। কিন্তু এ তো কেবল শাড়ি আর জুতোর দোকান। ফুটপাথের অবস্থা তো দেখছি ভীষণ খারাপ।

এটা তো আমেরিকা নয়, আমাদের শহর-টহর এরকমই। বেশী নাক সিঁটকোবে না।

একটু না সিঁটকে যে উপায় নেই। বিশ্রী গন্ধ।

কই, আমি তো পাচ্ছি না। আমাদের অবশ্য সয়ে গেছে। আর তোমার বাপু আমেরিকান নাক, ভারি সেন্‌সিটিভ।

তাই হবে। কিন্তু তোমার এখানে কি কাজ বল তো?

কি আবার, কেনাকাটা।

কি কিনবে, শাড়ি?

না, অত পয়সা নেই। এই টুকটাক কয়েকটা সাজের জিনিস। আর একটা বিউটি পারলারে আধঘণ্টা।

ও বাবা, বিউটি পারলারে তুমি গেলে আমি কোথায় দাঁড়াব?

কেন, ওদের ওয়েটিং রুম নেই বুঝি?

সেখানে তো মেয়েরা থাকবে।

তাতে কি? মেয়েদের ভয় পাও নাকি?

না, মেয়েদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তবে কি জান, আমেরিকাতে আমি কখনো কোনো বিউটি পারলারে যাইনি। দরকার পড়েনি।

বাজে কথা। তোমার কি মেয়ে-বন্ধু ছিল না?

থাকবে না কেন? কিন্তু আমাকে তারা বিউটি পারলারে তো নিয়ে যায়নি।

তবে কোথায় নিয়ে গেছে?

বেড়াতে-টেড়াতে। আউটিং-এ।

কতগুলো মেয়ে-বন্ধু ছিল তোমার?

গুণিনি। ছিল কয়েকজন। বিভিন্ন স্টেজে আলাদা আলাদা।

খুব ইনটিম্যাসি ছিল তাদের সঙ্গে?

ইউ মিন লাভ? না, সেরকম নয়।

ডেট করেছ কাউকে?

ডেট করা কাকে বলে তুমি জান?

খুব জানি মশাই।

ডেট করাটা খুব নরম্যাল। সিরিয়াস কিছু নয় ব্যাপারটা।

মেমসাহেবরা খুব নির্লজ্জ হয়, তাই না?

দেবব্রত একটু ভেবে বলল, ঠিক তা নয়। তবে অকারণ সংকোচ তো নেই। বেশ ফ্রী।

তোমার সঙ্গে কারও প্রেম হয়নি কখনো?

না। মা একটু প্রাচীনপন্থী ছিলেন। আমাদের ওপর রাশ টানা ছিল। তবে ফিজিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স-এর কথা যদি বল, তবে—

তবে কি? থামলে কেন?

সেটা না হয়ে উপায় থাকে না। হয়েই যায় কোনো না কোনো ভাবে।

তুমি খুব পাকা।

তা বলতে পার। ম্যাচিউরিটি তো! তোমাদের চেয়ে আমার ম্যাচিউরিটি বেশী।

মোটেই ম্যাচিউরিটি নয়। ম্যাচিউরিটি আর অসভ্যতা কি এক নাকি?

দেবব্রত একটু হাসল, বলল, যস্মিন দেশে যদাচার। তুমি যেটাকে অসভ্যতা বলছ সেটা ওখানে ডায়ার নীড।

ভুরু তুলে শিবানী ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, নীড! আহা রে, নীড বললেই বুঝি সব অসভ্যতার অজুহাত খাড়া করা যায়!

দেবব্রত একটু তটস্থ হয়ে বলল, দেখ, এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে ওদের দৃষ্টিভঙ্গির অনেক তফাৎ। তবে এটুকু বলতে পারি, ওদের বিয়ে নিয়ে অনেক প্রবলেম রয়েছে। প্রচণ্ড খাটতেও হয়, রোজগার না করলে উপায় নেই। ফলে ওরা অল্পবয়স থেকেই কেমন যেন একটু ঝরঝরে হয়ে ওঠে। ফিজিক্যাল নীডটাকে ছেলে আর মেয়েরা খুব ক্যাজুয়ালি দেখে।

বাজে বোকো না।

দেবব্রত একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, আচ্ছা। কিন্তু এ সব কথা আমি বলতে চাইনি। তুমিই বলিয়েছ।

ভিড়ের মধ্যে দুজনে চুপচাপ কিছুটা হাঁটল। শিবানী হঠাৎ বলল, কোনো মেয়েকে তোমার ভাল লাগেনি?

লেগেছে। অনেকেই ভাল।

কাকে সবচেয়ে বেশী ভাল লাগত?

তার নাম লু।

কেমন দেখতে?

ভালই।

তার কথা বল।

কি বলব, তার পারিবারিক কথা?

না, মেয়েটা কেমন?

খুব সহানুভূতিশীল, ফ্রেণ্ডলি, স্পোর্টিং টাইপ, খুব সরল

ফেইথফুল?

বলা শক্ত। ওর অনেক ছেলে-বন্ধু ছিল।

হুল্লোড়বাজ ?

না, তেমন নয়। বরং সব ব্যাপারেই খুব সিরিয়াস।

ওকে তোমার ভাল লাগত কেন ?

সব মিলিয়ে বেশ ইন্টারেস্টিং।

তাকে তুমি বিয়ে করবে ?

আরে দূর, বিয়ের কথা ওঠেই না। মা বাবা কেউই পছন্দ করত না। আমেরিকান মেয়েদের সঙ্গে আমাদের দু ভাইয়ের মেলামেশা। দাদা যে বিয়ে করেছে তা বাবা মা অ্যাপ্রুভ করেনি।

তুমি তাহলে কি করবে ?

বিয়ের কথা বলছ ? আমি ভাবিনি কিছু।

ধর যদি কোনো মেমসাহেবের প্রেমে সিরিয়াসলি পড়ে যাও, তাহলে ?

আমার অত প্রেম-প্রেম বাতিক নেই।

যদির কথা বলছি।

দেবব্রত একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, রোম্যান্টিক অ্যাটিচুডই আমার আর নেই। ওসব কেটে গেছে। তুমি যে আজ কেন এ প্রসঙ্গটাই বারবার তুলছ. ও সব ছাড়া আর কিছু বলার নেই ?

আচ্ছা, আর বলব না। ওই আমার দোকান।

শিবানী অনেকটা সময় নিয়ে জিনিসপত্র কিনতে লাগল। ততক্ষণ দেবব্রত চারদিক দেখছিল চেয়ে চেয়ে। ঘিঞ্জি, নোংরা, ভিড়, চেঁচামেচি, ধূলো, রোদ। পরিবেশটাই বিরক্তিকর। তবু দেবব্রতর খুব একটা খারাপ লাগছিল না। কারণ, সব কিছু ছাপিয়ে একটা প্রাণের স্পর্শ আছে কোথাও। আর আছে খারাপ স্বাস্থ্য কিন্তু সুন্দর মুখশ্রীর মহিলারা।

কেনাকাটা শেষ করে শিবানী বলল, এবার চল বিউটি পার্লার।

যেতেই হবে ?

চুলটা ঠিক করাব যে। ভয় নেই, পার্লারটা চালায় আমাদের পাড়ারই একজন মহিলা। দারুণ পারসোনালিটি।

চল।

বিউটি পার্লারে ঢুকে দেবব্রতর বেশ ভাল লাগল। সামনের দিকে খুব ক্ষুদে একটা ওয়েটিং রুম। চমৎকার সাজানো। চারটে দেয়ালেই পুরোপুরি মাদুরের ঢাকনা। সরা, অলংকৃত কুলো, কড়ি দিয়ে দেয়ালগুলোয় নানা সুন্দর শিল্পকর্ম করা হয়েছে। পুরোনো আমলের সোফা এবং টেবিল। মেঝেয় পাটের তৈরি কার্পেট। ঘরে একটা সুগন্ধও আছে। খুব মৃদু।

শিবানী তাকে বসিয়ে রেখে ভিতরে চলে গেল। ফিরে এল দু মিনিটের মধ্যেই। সঙ্গে বছর পঁচিশ ছাব্বিশের এক সুদর্শনা মহিলা।

এই যে পুঁটুদা, এঁর কথাই তোমাকে বলেছিলাম। রুমকিদি। একদম সেলফ মেড উওম্যান। তোমাদের আমেরিকান মেয়েদের চেয়ে কম নয়।

দেবব্রত উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুগ্ধ হয়ে গেল। রুমকির চেহারা ভাল, সন্দেহ নেই। তার চেয়েও বড় কথা এই মহিলার মুখে শ্রম এবং আত্মবিশ্বাসের প্রবল ছাপ রয়েছে। একটু বিষণ্ণতাও কি?

রুমকি বলল, বসুন। শিবানী বলেছিল আপনার কথা, এই দেশে নাকি প্রথম এলেন!

হ্যাঁ।

কেমন লাগছে? নোংরা, ঘিঞ্জি, ভিড়, অভাবগ্রস্ত – তাই না?

সে তো বটেই, তবু খুব খারাপ লাগছে না। হয়তো পরে আর একটু ভাল লাগবে।

শুনলাম, আপনি নাকি আর থাকতে চাইছেন না বেশিদিন এখানে।

দেবব্রত যেন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে এমন ভাবে বলল,

আসলে দেশ হলেও এটা একরকম বিদেশ আমার কাছে। বন্ধুবান্ধব, চেনা সব জায়গা কিছুই তো নেই।

সে তো ঠিক কথা। কফি খাবেন তো? এসময়ে আমরা একটু কফি খাই।

আপনার কাজের অসুবিধা হবে না?

না, আজ বৃহস্পতিবার বলে ক্লায়েন্ট খুব কম।

কেন? আজ কি ছুটির দিন?

না, ছুটির দিনে বেশি ভিড় হয়। বৃহস্পতিবারটা লক্ষ্মীবার বলে মেয়েরা বিউটি ট্রিটমেন্ট করায় না। বসুন, ইজি হয়ে বসুন। একটু আড্ডা দিই।

দেবব্রতর বেশ ভাল লাগছিল। এই মহিলা বেশ খোলামেলা, সংকোচহীন, যেমনটা বিশেষ তার চোখে পড়েনি।

কফি এল। তারা বসে গল্প করতে লাগল। বেশির ভাগই দেবব্রতর মুখে আমেরিকার গল্প শোনা।

কফি খেয়ে শিবানী ভিতরে ঢুকল চুল ঠিক করাতে।

কনকি দেবব্রতর দিকে চেয়ে বলল, আপনার বয়স কত?

পঁচিশ।

আমার কত জানেন?

আপনি বোধহয় আমার সমানই হবেন।

কনকি মাথা নাড়ল, না। একটু বেশি। কিন্তু বয়সের তুলনায় নিজেকে আমার অনেক বেশি বুড়ো বলে মনে হয়।

কেন?

এত যে খাটুনি আর ধকল যায়, টাকা রোজগার ছাড়া আর যে কোনো আনন্দ নেই সেইটেই আমাকে বুড়িয়ে দিচ্ছে। একটা সিনেমা থিয়েটার দেখতে পাই না, গান শুনি না। নো এন্টারটেনমেন্ট।

কেন? শুধু কাজ নিয়ে থাকলে কি হবে? এন্টারটেনমেন্ট তো চাই।

রুমকি একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার জীবনটাই এরকম যে এন্টারটেনমেন্টের ইচ্ছেটাই চলে গেছে। শুধু কাজ আর কাজ।

দেবব্রত অবাক হয়ে বলল, একটা বিউটি পারলারে কত কাজ থাকতে পারে?

রুমকি একটু হেসে বলল, সে আপনি পুরুষ মানুষ, বুঝবেন না। এখানেও অনেক কাজ আছে। তা ছাড়া আমার আর একটা ব্যবসা আছে। শাড়ির। এখন ডিম্যাণ্ড এত বেড়েছে যে, সাপ্লাই দিয়ে ওঠা যাচ্ছে না।

তাহলে এক্সপাণ্ড করুন, লোক রাখুন।

রুমকি মুচকি একটু হেসে বলল, এ কি ইণ্ডাস্ট্রি যে কারখানা বড় করে প্রোডাকশন দশগুণ করে ফেলা যায়। এ হল শিল্পকর্ম, আর্ট। প্রত্যেকটা শাড়ির জন্য নতুন ডিজাইন করতে হয়, নকশা করতে হয়। লোক বাড়ালে লাভ নেই।

দেবব্রত মাথা নেড়ে বলল, বুঝেছি।

হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠে রুমকি বলল, যাবেন আমার শাড়ির সেন্টার দেখতে? বেশি দূর নয়। শিবানীর এখনো বেশ সময় লাগবে।

দেবব্রত একটু ইতস্তত: করে বলল, শাড়ির ব্যাপারে শিবানীরও হয়তো ইন্টারেস্ট হবে।

ও অনেকবার দেখেছে, আপনি দেখেননি। এ দেশের মেয়েরা কিরকম লড়াই চালাচ্ছে তা আপনার দেখা উচিত। কত বাধা আমাদের, কত লোকলজ্জা, ছিছিক্কার, কত অপমান, টিটকিরি সয়ে, তবে এদেশের মেয়েরা এসব কাজে নামে। মেয়েরা স্বাধীনভাবে কিছু করতে চাইলেই এদেশের অকর্মণ্য উন্নাসিক পুরুষেরা বলতে শুরু করে, ওটা কিছু নয়, ছেলেমানুষী, ও মেয়েদের দ্বারা হওয়ার নয়, ওসব ছেড়ে বিয়ে করে ঘরসংসার পেতে বোসো···ইত্যাদি। বিবাহিতা মেয়েদেরও হাল একই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাপের বাড়ি বা শ্বশুর বাড়ি কোনো পক্ষেরই সমর্থন পায় না, এমন কি স্বামী পর্যন্ত বিগড়ে যায়। এ

দেশের মেয়ে যদি কিছু গড়ে তুলতে পারে তবে সেটা অনেক বেশী প্রশংসার যোগ্য। তাই না?

দেবব্রত অপ্রতিভ হয়ে বলল, এরকম আমিও খানিকটা শুনেছি। মেয়েদের এখানে খুব কষ্ট। চলুন আপনার আর্ট সেন্টার দেখে আসি।

দাঁড়ান, শিবানীকে জানিয়ে যাই, নইলে ভাববে ওর সুন্দর ভাইটিকে নিয়ে অন্য মতলবে কেটে পড়েছি।

দেবব্রত ক্রমাগত চারদিকটাকে যতদূর সম্ভব লক্ষ্য করে যাচ্ছে। এ দেশটাকে যতদূর সম্ভব কম সময়ে জেনে নিতে হলে চোখ কান বিস্ফারিত রাখতেই হবে। খুব বেশী মানুষকে সে এখন অবধি দেখেনি। যে কয়েকজনকে দেখেছে প্রত্যেককেই দেখছে, মাপছে, ওজন করছে, পটভূমিতে স্থাপন করছে আর এইভাবেই বুঝবার চেষ্টা করছে দেশ-কাল-পাত্রপাত্রী। এক ধরনের একাডেমিক ইন্টারেস্ট। তবে এখন অবধি সে নিজে কোনো মানুষের সঙ্গেই ভাবাবেগ, ভালবাসা বা বন্ধুত্বে জড়িয়ে পড়েনি। দূরত্ব থেকে যাচ্ছে। তবু শিবানীকে তার একরকম ভাল লেগেছিল। দ্বিতীয় যাকে ভাল লাগল সে হল রুমকি।

রুমকির গাড়ি করে যখন সে আর্ট সেন্টারে এল তখনও তেমন বিস্মিত হওয়ার মতো কিছু দেখেনি। একটা মস্ত হলঘরে এবং আরও কয়েকটা ঘরে অনেক যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা মহিলা ছুঁচ সুতো, রং পেনসিল, চক, কাঁটা কম্পাস ইত্যাদি দিয়ে হরেক রকম কাজ করে যাচ্ছে শাড়ির ওপর। এরকম তো হতেই পারে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি রুমকির তদগত ভালবাসা, কাজের প্রতি তীব্র আসক্তি, পরিশ্রম করার অমিত আগ্রহ দেখে সে অবাক হল। নিজের কাজকে ভাল না বাসলে কাজও নষ্ট হয়, মানুষটাও হয়ে যায় গেঁতো ফাঁকিবাজ, অসফল। কলকাতায় পা দেওয়ার পর থেকেই সে এরকমই সব লোকজনকে দেখেছে। ব্যতিক্রম এই প্রথম। দেখে সে মুগ্ধ হল। তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে রেখে রুমকি ঝাঁপিয়ে পড়ল কাজে। কয়েকটা নকশা দেখে একটু সংশোধন করল, নিজে হাতে জনা

ছুয়েকের ডিজাইন তোলার কাজে সাহায্য করল, ড্রয়িং বোর্ডে বসে চটপটে হাতে কয়েকটা নকশা এঁকে দিল। সুবেশা, সুন্দরী, যুবতী, বয়স্কা বেশ কয়েকজন খদ্দের এসে তাগাদা দিচ্ছিল। তাদের সঙ্গে কথা বলল রুমকি। টেলিফোন রিসিভ করল গোটা তিনেক। তারই ফাঁকে ফাঁকে এক একবার তাকাচ্ছিল দেবব্রতর দিকে, স্মিত হাসছিল।

অবশেষে ঘেমেচুমে এসে সামনে বসে রুমকি বলল, দেখছেন তো অবস্থা? তবু বেশ আছি। যতক্ষণ কাজ ততক্ষণ শ্বাস. অকাজে সময় কাটাতে একটুও ভাল লাগে না।

তাই তো দেখছি।

আমেরিকায় আমার মতো হয়তো কত আছে. এদেশে সেলফ সাফিসিয়েন্ট মেয়ে বড় একটা নেই, সেলফ-মেডও কম। আমি এই যে দেখছেন সব মেয়েদের কাজ দিয়ে রেখেছি এদের কিন্তু আমি রোজ বলি, কাজ শেখো, অর্গানাইজ করতে শেখো, কিছু ক্যাপিট্যাল করো তারপর নিজের পায়ে গিয়ে নিজে দাঁড়াও। আমি কাউকে আটকে রাখব না। আমি ব্যবসা করেই থেমে থাকতে চাই না, এদেশের মেয়েদের দাসখৎ থেকে মুক্তিও দিতে চাই।

দাসখৎ মানে কি বিয়েকে মীন করছেন?

রুমকি ম্লান একটু হেসে বলল, এদেশে ডিভোর্সের তেমন চলন হয়নি, তাই বিয়ে এখনো ভীষণ একটা দাসখৎ বটে, কিন্তু শুধু বিয়েই নয়। বাপের বাড়িতেও মেয়েদের বড্ড বেশি অনুশাসন মেনে চলতে হয়। দাসখৎ যে কতরকম। সবচেয়ে বড় দাসখৎটা অবশ্য মেয়েদের স্বভাবেই রয়েছে। তারা সহজে প্রথা ভাঙতে চায় না।

উইমেনস লিব। বলে দেবব্রত মৃদু একটু হাসল।

মেয়েদের আর কোন স্বাধীনতা পাওয়া সহজ কিনা জানি না, তবে ফিনানসিয়াল লিবারেশন একটা মস্ত কথা। ওটা হলে মেয়েরা বেশ খানিকটা স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে।

যেমন আপনি?

আমি তো সামান্য। মেয়েরা আজকাল বড় ইণ্ডাস্ট্রিরও হাল ধরছে। তবে সংখ্যায় তারা আর কতই বা বলুন।

আপনি মেয়েদের কথাই ভাবেন? ছেলেদের কথা ভাবেন না?

ছেলেদের কথা! তাদের কথা তো সবাই ভাবে।

দেবব্রত মাথা নেড়ে বলল, লিবারেটেড যদি মনেপ্রাণে হয়ে থাকেন তাহলে জানবেন, লিবারেশন ছেলেদেরও দরকার। সমদৃষ্টি না থাকলে আপনার চেষ্টা একপেশে হয়ে যাবে। আজকাল উইমেনস লিবের অনেক মেয়েকে দেখি আস্তে আস্তে ম্যান-হেটার হয়ে যাচ্ছে!

ঘেন্না করার মতো কাজ করলে ঘেন্না তো হওয়াই উচিত।

দেবব্রত ঈষৎ বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, সমস্ত পুরুষ জাতটাকেই কি আপনার ঘেন্না হয়?

তা হবে কেন? বলে রুমকি স্নিগ্ধ একটু হেসে বলল, কই আপনাকে তো একটুও হচ্ছে না। কিন্তু আমরা বোধহয় তর্ক পাকিয়ে ফেলছি। আমি যা বলতে চাইছিলাম তা একপেশে নয়। তবে মেয়েদের শেকল খুলতে গেলে যে জোরটা প্রয়োজন হবে তাতে প্রথম দিকে আন্দোলনটাকে একপেশে মনে হবে বটে, কিন্তু তারপর ব্যালান্স আসবে।

উইমেনস লিব-এ পুরুষরাও তো হাত লাগিয়েছে। তাদের রোলটাও বড় কম নয়।

অস্বীকার করছি না! তবু মনে মনে পুরুষেরা জানে যে, তারা সুপিরিয়র।

দেবব্রত লঘু স্বরে বলে, কিংবা মেয়েরাই ভাবে না তো যে তারা ইনফিরিয়র? অনেক মেয়েই ম্যাকেনরোর মতো টেনিস খেলতে চায়, কার্ল লিউসের মতো দৌড়োতে চায়, রকেফেলারের মতো ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হতে চায়। তারা বোঝে না যে, পুরুষেরাও ম্যাকেনরো, লিউস বা রকেফেলার হয়ে উঠছে না গণ্ডায় গণ্ডায়।

রুমকি হঠাৎ তর্ক স্থগিত রেখে বলল, আচ্ছা, শুনেছি আপনি জন্ম

থেকেই আমেরিকার মানুষ, কখনো এদেশে আসেননি। তাহলে এত ভাল বাংলা বলেন কি করে ?

আমার মা আমাদের এই অভ্যাসটা করিয়ে গেছেন। বাড়িতে বরাবর আমাদের পুরোদস্তুর বাংলায় কথা বলতে হয়েছে। বাংলা সাহিত্য, গান, ব্যাকরণ সব কিছু শিখতে হয়েছিল। সরস্বতী পুজো, দুর্গা পুজোয় অঞ্জলি দিতে হত।

বাঃ, বেশ পারসোন্যালিটি তো আপনার মায়ের।

দেবব্রত করুণ মুখ করে বলল, আমার মা বেঁচে নেই, কিন্তু দেখুন আজও আমার ওপর মায়ের কি গভীর প্রভাব। মেয়েরা পুরুষশাসিত সমাজের কত নিন্দে করে, অথচ দেখুন বেশির ভাগ পুরুষের জীবনেই মেয়েদের অনুশাসন, শিক্ষা, প্রভাব কি সাঙ্ঘাতিক। পুরুষরাই তো মেয়েদের দ্বারা শাসিত।

রুমকি কপালের ঘাম আঁচলে মুছে নিয়ে বলল, খুব কথা শিখেছেন। কিন্তু কথাগুলো আইওয়াশ। দাঁড়ান, এবার আপনাকে শিবানীর কাছে নিয়ে না গেলেই নয়। বেচারা বোধহয় বসে আছে।

অগত্যা আবার বিউটি পারলার।

শিবানীর হয়ে গিয়েছিল সত্যিই। তবে বেশিক্ষণ নয়। তাদের দেখে বলে উঠল, এক্ষুণি ফোন করতে যাচ্ছিলাম!

ফেরার পথে ট্যাকসি ধরল দেবব্রত। তারপর বলল, ভদ্রমহিলা বেশ ইণ্টারেস্টিং।

শিবানী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, ফ্যাণ্টাস্টিক। কত ইনকাম ট্যাকস দেয় জানো বছরে ? চল্লিশ হাজার টাকা।

তার মানে নিয়ার অ্যাবাউট ফোর থাউজ্যাণ্ড ডলার ?

ডলারের আমি কি জানি।

আরে দাঁড়াও, টাকার অ্যামাউণ্টে আমি ঠিক থৈ পাই না। কিন্তু অ্যামাউণ্টটা খুব বিগ বলে মনে হচ্ছে না তো!

উঃ, তুমি যে কি একটা বুদ্ধু না! অ্যামেরিকানরা বড়লোক,

তাদের দেশের তুলনায় বেশী তো নয়ই। কিন্তু এদেশের পার ক্যাপিটাল ইনকামের হিসেবে ঢের বেশী। তার ওপর ব্ল্যাক মানি আছে না! সব হিসেব কি দেখায় নাকি?

ওঃ তাই বল।

রুমকিদি আরো কত কি করতে পারত। একটা শো পিস ফার্নিচারের দোকান, একটা শো-হাউস করার প্ল্যান ছিল। হল না।

কেন হল না?

রুমকিদি আমাদের পাড়ার এক মস্তানের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল।

ওঃ. প্রেম একটা হয়েছিল তাহলে? কিন্তু কথা শুনে উল্টো মনে হচ্ছিল।

এখন উল্টোই। ছেলেটা এমন কেলেঙ্কারী করল।

কি করল?

যখন রুমকিদি ওকে বিয়ে করার কথা সিরিয়াসলি ভাবছে তখনই ছেলেটা ভট করে একজনকে খুন করে বসল।

বল কি?

যাকে খুন করল সেও এক গুণ্ডা। দত্তগুপ্তদার চেলা ছিল। নাম নান্নু। ছেলেটা মৌলি।

খুন করেছিল কেন?

লোকে বলে দত্তগুপ্তদার হুকুমে। ছেলেটার নাকি খুন করার ইচ্ছে ছিল না। সেও রুমকিদির বিজনেস-এ নামবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু দত্তগুপ্তদা তখনই ওকে খুনটা করতে বাধ্য করেন।

দত্তগুপ্ত কি খুব গডফাদার টাইপের লোক?

বটেই তো। তারই তপোবনে তো তুমি আজ গিয়ে হাজির হয়েছিলে।

ওটা তপোবন?

লোকে তো তাই বলে।

কেন বলে?

দত্তগুপ্তদা শুনেছি তান্ত্রিক। কি সব তন্ত্রমন্ত্র আর জপতপ করে।

এদেশের সাধুরা অনেক ট্রিক জানে শুনেছি।

দত্তগুপ্তদা সেরকম সাধু নয়। তবে ব্যাচেলার।

মৌলি না কি নাম বললে, তার কি ফাঁসি-টাঁসি হয়েছে?

না। খুব ভাল প্রমাণ না পাওয়ায় কিছুদিন জেল হয়েছিল। খুব সম্প্রতি খালাস পেয়েছে।

তাহলে রুমকির প্রবলেম তো নেই। ইচ্ছে করলে ওকে বিয়ে করতে পারে।

তুমি ভীষণ বোকা। রুমকিদির বিশ্বাসটাই তো মৌলি নষ্ট করে দিল। একজন খুনীর সঙ্গে কি ঘর করা যায়? রুমকিদি নিজেই বলেছে, একজন ভাল লোকও হঠাৎ পরিস্থিতির চাপে হঠাৎ একটা খুন করে বসতে পারে, সেটা ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু মৌলি যা করেছে তা ঠাণ্ডা মাথায়, হিসেব কষে। অবশ্য মৌলি নয়, হিসেবটা কষেছিল দত্তগুপ্তদা। এক ঢিলে দুই পাখি। বেচারা রুমকিদি!

মৌলির সঙ্গে একবার আমার দেখা করিয়ে দিতে পার?

কেন, তার সঙ্গে তোমার কি দরকার?

এমনি, লোকটাকে ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে।

দারুণ ইন্টারেস্টিং, দুর্দান্ত চেহারা, লেখাপড়াও জানে। রুমকিদি কেন, পাড়ার আরও অনেক মেয়েই ইন্টারেস্টেড ছিল। কিন্তু গুণ্ডা বলে কেউ তেমন ঘেঁষতে পারেনি। বিশেষ করে দত্তগুপ্তদা তার চেলাদের সঙ্গে মেয়েদের মেশামেশি পছন্দ করত না। লোকটা মেয়েদের ব্যাপারে স্যাডিস্ট।

খুব কমপ্লেকস ব্যাপার তো।

দারুণ কমপ্লেকস। এখন আবার আর এক বিপদ দেখা দিয়েছে।

কি বিপদ?

মৌলি রিলিজ হয়ে আসায় সকলে ভয় পাচ্ছে ও হয়তো নান্টুর মতোই আলাদা দল করে দত্তগুপ্তদাকে জব্দ করার চেষ্টা করবে।

আর দলগুলো চেষ্টা করবে মৌলিকে খুন করতে। ফলে পাড়ায় আবার রক্তারক্তি কাণ্ড হবে।

রুমকির সঙ্গে মৌলির দেখা হয়নি?

জানি না। না হওয়াই সম্ভব। রুমকিদি তো পাড়ায় থাকেই না সারাদিন। কোন ভোরে বেরোয়, আর সেই রাত্রিবেলা ফেরে।

যে ছেলেটা তপোবনে আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিল তার নাম যেন কি বললে?

ট্যারা গুলে।

ভেরি টাফ লুকিং।

শুধু লুকস নয়, হি ইজ রিয়েলি টাফ। ট্যারা গুলে যে কত খুন করেছে।

মৌলি কি ওর চেয়েও টাফ?

শিবানী একটু ভাবল। তারপর বলল, ট্যারা গুলের মধ্যে ভদ্রলোকের কোনো লক্ষণ নেই। মৌলি কিন্তু ওরকম নয়। বেশ ভদ্রলোক, কথাবার্তায় ভাল, খামোখা কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না। শুধু অ্যাকশনের সময় হয়তো অন্যরকম।

ট্যাকসি এসে বাড়ির সামনে থামল। প্রসঙ্গটাও চাপা পড়ে গেল।

দুপুরে খাওয়ার পর দেবব্রত ঘুমোতে পারে না। তার অভ্যাস নেই। সে বইপত্র নিয়ে বসল। কিছুক্ষণ পাতা উল্টে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। রুমকির ঘামে ভেজা দারুণ মুখখানা মনে পড়ে গেল তার। মেয়েটার মুখে অত হাসিখুশি ভাবের মধ্যেও একটা গভীর গোপন বিষাদের ভাব সে লক্ষ্য করেছিল। কিন্তু তখন ধরতে পারেনি। মেয়েদের স্বনির্ভরতা নিয়ে রুমকি যতটা বলছে বা লড়ছে তার চেয়ে ভিতরে ভিতরে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে বেশি।

না, রুমকির জন্য দেবব্রতর কিছু করার নেই।

বই রেখে দেবব্রত উঠে বারান্দায় এল। তপোবনের দিকটা খুব

ভাল দেখা যাচ্ছে না। সে ঘর থেকে তার হাল মডেলের নিকন ক্যামেরা নিয়ে এল। টেলি লেনস লাগিয়ে দেখার চেষ্টা করল কিছুক্ষণ! কিন্তু দুরূহ কোণ বলে কিছুই দেখা গেল না। ছাদ থেকে দেখা যাবে কি?

দেবব্রত দ্রুত লঘু পায়ে ছাদে এসে দেখল, তপোবন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। টেলি লেনসের ভিতর দিয়ে সে মনোরম গাছপালায় সমাচ্ছন্ন তপোবনের ভিতরে তেমন খুঁটিনাটি দেখতে পেল না অবশ্য। তবু চোখে পড়ল বিশাল ফুলের বাগান, হরিণ, পুকুরে পদ্মপাতা, কুটিরের গায়ে লতানো গাছ, পরিষ্কার নিকোনো উঠোন। রোদে সব ঝিমঝিম করছে। কোনো লোক নেই।

দেবব্রত কয়েকটা ছবি তুলে নিল। কোনো কাজে লাগবে না। তবু নিল। কারণ ক্যামেরায় কালার ফিল্ম লোড করা আছে। রঙিন ফিলম সাত আট দিনের ভিতর না তুললে নষ্ট হয়ে যায়। রোলটা তাই শেষ করা দরকার।

বিকেলে বুধো খবর আনল, এয়ারপোর্টে ফোন করে জানা গেছে, তাদের সুটকেস ভুল প্লেনে উঠে হংকং চলে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফেরৎ আসছে কলতাতায়। আগামী শুক্র বা শনিবার কলকাতা এয়ারপোর্টের কাস্টমসে কাগজপত্র নিয়ে গিয়ে মালিকানা প্রমাণ করলে ফেরৎ পাওয়া যাবে।

খবরটা যথেষ্ট ভাল। সুটকেসে তপোব্রতর ওষুধ ছাড়াও কিছু দামী জিনিস আছে।

সুটকেস নিয়ে কথা হচ্ছিল বুধোদের খাওয়ার ঘরে বসে। বুধো, তপোব্রত, দেবব্রত আর শিবানী। বুধো হঠাৎ কথার মাঝখানে শিবানীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, বুড়ান কোথায় রে?

বাড়ি নেই।

বাড়ি নেই সে জানি, কিন্তু গেল কোথায়?

সে খবর দিয়ে যায় নাকি?

বুধো একটু উষ্মার সঙ্গে বলল, কাল থেকে যেন হুটহাট বাড়ির বাইরে না যায়, বলে দিস।

বললেই কি শুনবে? আমি কিছু বললেই তো ওর গায়ে ফোস্কা পড়ে।

উঃ, এই ছেলেটাকে নিয়ে যে কি প্রবলেম! একটা ন্যুইসেন্স হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

দেবব্রত তাকিয়ে কথাবার্তার প্রবাহ থেকে সত্যটা বুঝবার চেষ্টা করছিল। বুড়ান যে এদের একটা সমস্যা সে বিষয়ে তার সন্দেহ নেই। সকালেই বুড়ান তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিল অকারণে। কিন্তু দেবব্রত বুড়ান সম্পর্কে প্রকাশ্যে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করল না। স্বাভাবিক ভদ্রতাবোধে।

তিনতলায় তার আর এক কাকিমা থাকে। তার কাছে বিকেলে চায়ের এবং রাত্তে খাওয়ার নেমন্তন্ন বলে দেবব্রত আর তপোব্রতকে উঠতে হল। কিন্তু ঘরের ভিতরে বুধো আর শিবানীর উত্তপ্ত কণ্ঠস্বর তারা অনেক দূর অবধি শুনতে পেল।

আত্মীয়স্বজন কিরকম হয়, কেমন ব্যবহার তাদের সঙ্গে করা উচিত এটা দেবব্রতর অভিজ্ঞতায় নেই। তবু এই লোকগুলোকে এখন তার খুব একটা খারাপ লাগছে না। ছোটো কাকিমা মানুষটি মন্দ নয়. একটু মা-মা ভাব আছে। কাছে গেলেই থুতনি ধরে আদর করে। প্রায়ই বলে, আমাকে মা বলে ডাকিস।

বিকেলের নেমন্তন্ন তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দেবব্রত একটু রাস্তায় বেরোল। হাঁটাচলা এখানে এসে কমে যাচ্ছে। শরীর নাড়াচাড়া যাচ্ছে না। তার এখন দরকার দৌড়, সাঁতার, টেনিস, জিমনাস্টিকস, সম্ভব হলে কিছুক্ষণ মুষ্টিযুদ্ধের মহড়া। কিন্তু সে সব এখানে সহজলভ্য নয়। পাড়ায় একটা ক্লাব আছে বটে, কিন্তু সেখানে তাস দাবা আব পত্রিকা পড়ার সুযোগ আছে। আর কিছু নেই।

গলির রাস্তায় বেশ ভিড়। বেশির ভাগ মানুষেরই মুখে অগাধ

ক্লান্তি আর বিরক্তির ছাপ। জীবনযাপনের কোনো আনন্দই যে এদের নেই তা মুখে স্পষ্ট ফুটে আছে।

হাঁটতে হাঁটতে কোন অদৃশ্য টানে ফের তপোবনের কাছাকাছি চলে এল দেবব্রত। এদিকটা নির্জন, নিঝুম। একটু অন্ধকারও নেমে এসেছে।

ফটকটার কাছে দেবব্রত কয়েক সেকেণ্ডের জন্য একটু দাঁড়াল। জায়গাটা কি খুব বিপজ্জনক? কিন্তু এটা গডফাদারের আস্তানা হলে রীতিমত পাহারার ব্যবস্থা থাকা উচিত। তা কোথায়? কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না।

দেবব্রত চারদিকে চেয়ে ফটকটার দিকে দ্বিধান্বিত এক পা এগিয়েছে মাত্র, হঠাৎ ফটকের ভিতরে একটি ছেলে যেন মাটি ফুঁড়ে আবির্ভূত হল।

কাকে চাই?

দেবব্রত খুব সহজে ঘাবড়ায় না, ভয়ও পায় না, তবে ছেলেটাকে দেখে তার মুখে প্রথমে কথা সরল না। ছেলেটা বুড়ান।

বেশ খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বলল, তুমি এখানে?

বুড়ানের ডান হাতখানা কোমরে, জামার তলায়। সম্ভবতঃ কোনো অস্ত্রশস্ত্র আছে। ছেলেটা যে বখে গেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দেবব্রতকে চিনতে পেরেও মুখখানা থমথমে করে চেয়ে রইল কঠিন চোখে। প্রশ্নটার জবাব দিল না।

দেবব্রত অস্বস্তি বোধ করে বলল, বাগানটা দেখছিলাম। চলে যাচ্ছি।

বুড়ান হঠাৎ বলল, দুপুরবেলা ছাদে উঠেছিলেন কেন?

দেবব্রত অবাক হয়ে বলল, ছাদে উঠেছিলাম কেন? ওটা কোনো প্রশ্ন নাকি! এমনি উঠেছিলাম, ইচ্ছে হয়েছিল।

অন্য কোনো মতলব নেই তো!

মতলব আবার কি?

আপনি তো টেলি লেনস লাগানো ক্যামেরা দিয়ে এখানকার ছবি তুলছিলেন।

দেবব্রত এবার বাস্তবিকই রেগে গেল। ছেলেটা বয়সে তার চেয়ে ছোটোই হবে, কিন্তু কথাবার্তা বড্ড চ্যাটাং চ্যাটাং। তা ছাড়া সে কেন ফটো তুলেছে তার কৈফিয়ৎ একেই বা দিতে হবে কেন?

দেবব্রত ঈষৎ তপ্ত স্বরে বলল, ছবি তুলেছি তো কি হয়েছে? কারও তো ক্ষতি হয়নি!

সে সব জানি না। ছবি তুলে আপনি খুব অন্যায় করেছেন। এখন যান, এখানে ঘুরঘুর করবেন না।

দেবব্রত বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। সকালে এখানেই গুলে বলে একজন তাকে অপমান করেছিল। এখন করছে তারই এক কাজিন। এ জায়গাটারই কি কোনো অভিশাপ আছে!

কিন্তু দেব্রবত ঝামেলা বাড়াতে চাইল না। শুধু বলল, আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি করি নি, শুধু শুধু এরকম করছো কেন?

ক্ষতি করেন নি? আজ সারাটা সকাল তো শিবানীর সঙ্গে অনেক লপটালপটি হল। অত আঠা কিসের? আমেরিকায় বুঝি ভাইবোন এমব হয়?

দেবব্রত বাংলা ভাষা জানে বটে, কিন্তু ততটা জানে না যাতে এর সব কথা বোঝা যায়। তবু এটুকু বুঝল যে, তাকে আর শিবানীকে জড়িয়ে এ ছোকরা অশ্লীল ইংগিত করছে।

দেবব্রত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চেয়ে রইল। তারপর চাপা স্বরে বলল, স্কাউণ্ড্রেল!

বুড়ান হঠাৎ হিংস্র গলায় বলে উঠল, এই, বেশী ইংরিজি ফোটাবে না। খোপড়ি খুলে দেব। শালা আপন খুড়তুতো বোনের সঙ্গে বৃন্দাবনলীলা করে বেড়ানো বের করে দেব একেবারে।

দেবব্রতর পিছু না হটে উপায় ছিল না। এ ছেলেটাকে শাসন করার মতো পরিস্থিতি এটা নয়। এর কোমরে লুকোনো অস্ত্র আছে।

পিছনে দলবল আছে, এরা নামতেও পারে অনেক নিচে। সে নতুন, এঁটে উঠবে না।

দেবব্রত আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। মুখটা ঘেন্নায় ফিরিয়ে নিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল।

পিছন থেকে পরিষ্কার বুড়ানের গলায় একটা গালাগাল ভেসে এল, শুয়োরের বাচ্চা!

দেবব্রত বাড়িতে এসে সোজা শিবানীকে গিয়ে ধরল, এই, তুমি আমাকে একটা কথা বলবে?

ও কিগো, তোমার মুখচোখ ওরকম দেখাচ্ছে কেন?

বলছি, তার আগে বল হোয়াট ইজ রং উইথ বুড়ান?

শিবানীর মুখে স্পষ্ট উদ্বেগ ফুটে উঠল, তোমার সঙ্গে বুড়ানের আবার কি হল?

দেবব্রত তার রুমালের কোণা উত্তেজনায় দাঁতে চেপে রেখেছিল।

শিবানী তার বেশ কাছাকাছি এসে মুখ তুলে চোখে চোখ রেখে বলল, বুড়ানকে তুমি কিছু বলনি তো!

কি বলব একটা স্কাউণ্ড্রেলকে?

ও তোমাকে অপমান করেছে নাকি? কি করেছে বল তো!

সেটা খুব অশ্লীল ইংগিত। সেটা থাক। কিন্তু ওর কি প্রবলেম?

শিবানী সামান্য একটু ভেবে নিয়ে বলল, বলতে গেলে অনেক কথা। শুধু এটুকু জেনে রাখ, ও হল ঘরশত্রু বিভীষণ।

তার মানে কি?

মানে ট্রেটার। ও আমাদের সঙ্গে বিট্রে করছে।

কি ভাবে?

দত্তগুপ্তর কথা তো শুনেছ।

সারা সকাল তো শুনলাম। গডফাদার।

তার ইচ্ছে এ বাড়িটা আমরা একজন পয়সাওলা লোককে বেচে দিই। দিলে দত্তগুপ্ত মোটা কমিশন পাবে। যে কিনবে সে এখানে

একটা মস্ত অ্যাপার্টমেন্ট বানাবে। সেখানেও দত্তগুপ্তর কিছু ভাতা থাকবে।

বুঝেছি। কিন্তু বুড়ানের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক ?

দত্তগুপ্তর হয়ে বুড়ানই এখন আমাদের সঙ্গে লড়াই করছে। বাড়ি বিক্রি হলে তারও বেশ কিছু আয় হবে।

বলো কি ?

বুড়ান আর আমাদের কেউ হয় না, বুঝলে ? বুড়ানকে এখন আমরা ভয় পাই, এড়িয়ে চলি।

কিন্তু এতদূর নিচে নামলো কি করে ? আমাকে কি বলেছে জানো ?

কি বলো তো ! তোমাকে ভীষণ উত্তেজিত দেখাচ্ছে।

কথাগুলো বলতে পারবো না। কিন্তু বোধহয় তোমার আর আমার রিলেশনটার মধ্যে ও একটা সেক্স-এর ব্যাপার সন্দেহ করছে।

শিবানী আচমকা টুকটুকে রাঙা হয়ে গেল লজ্জায়। শিহরিত হয়ে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে কানে আঙুল দিয়ে জিব কেটে বললো, ছিঃ, ছিঃ !

তুমি যেমন শক্‌ড আমিও তেমনি।

শিবানী ঘন ঘন শ্বাস টানলো। তারপর চোখ খুলে বললো, এতদূর নোংরা কবে থেকে হলো জানি না। তবে বুড়ানের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। আজ আসুক বাড়িতে।

কি করবে ? বকবে ?

কিছু নিশ্চয়ই করবো।

দেবব্রত মাথা নেড়ে বললো, ডোণ্ট ডু ছাট্, ও বেহেড। তোমাকে হয়তো মেরে বসবে। যদি কিছু বলতেই চাও আমার সামনে বোলো।

কেন ?

ওরকম ডেন্‌জারাস টাইপের ছেলেকে আমি হয়তো সামলাতে পারবো।

তাই হবে।

ও কখন ফেরে ?

ঠিক নেই। অনেক রাতে ফেরেও না।

খুনখারাপি করে নাকি, জানো ?

অসম্ভব নয়। দত্তগুপ্তর হয়ে যখন কাজ করে তখন সবই করে বোধহয়।

দত্তগুপ্ত কি হিপনোটিজম জানে ?

জানে নিশ্চয়ই। না হলে ওকে ভেড়া বানালো কিভাবে ?

দেবব্রত ঘরে ফিরে এসে অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলো।

তপোব্রত এসে বললেন, কিরে কি হয়েছে ?

কিছু হয়নি বাবা।

তপোব্রত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বললেন, তুই নিউ ইয়র্কেই ফিরে যা।

তপোব্রতর এই হঠাৎ আবির্ভাব এবং অযাচিত পরামর্শে মোটেই খুশি হলো না দেবব্রত। তপোব্রত হয়তো পাশের ঘর থেকে তার ও শিবানীর কথাবার্তা শুনেছেন। শুনে চিন্তিত হয়েছেন। দেবব্রত তো খুব মৃদু গলায় কথাগুলো বলেনি।

দেবব্রত খাটের বিছানায় কোলে বালিশ নিয়ে তার ওপর কনুইয়ের ভর রেখে গালে হাত দিয়ে বসেছিল। মুখ তুলে বললো, আমি চলে গেলেই যে তোমার প্রবলেম মিটবে তা তো নয়। ওই ছেলেটা বুড়ান, ও নাকি একজন লোকাল গডফাদারের সঙ্গে যুক্তি করে এই বাড়ি বেচে দেওয়ার মতলব করেছে।

জানি। আমাকে বুধো খানিকটা আঁচ দিয়েছিল। আমার জন্য ভাবছিস কেন ? আমেরিকান একসপ্রেস ব্যাঙ্কে আমার একটা মোটা অ্যাকাউন্ট আছে। দরকার হলে একটা ফ্ল্যাট কিনে নেওয়া যাবে।

কিন্তু তোমার ওরিজিন্যাল প্ল্যান তো তা ছিল না। তুমি চেয়েছিলে তোমার আপনজনদের সঙ্গে এসে থাকতে।

সব আকাঙ্ক্ষাই কি পূর্ণ হয় ? দেশে তো ফিরে আসতে পেরেছি !

দেবব্রত উত্তেজিত গলায় বললো, ইটস এ নোম্যানস সিটি। এট

তোমার দেশ হতে যাবে কেন? ন্যাচারাল সারাউণ্ডিংস নেই, চারটে লোক চার ভাষায় কথা বলে, ধান্ধাবাজ, অলস, বোকা, গোঁয়ার, স্মল টাইম ক্রুকস-এ ভরা। এ শহরটা কারোই দেশ হতে পারে না। তুমিও ফিরে চলো।

দরকার হলে যাবো। আমার অ্যামেরিকান পাসপোর্ট, যখন খুশি যাওয়া যাবে।

আমি তোমাকে এখনই আমার সঙ্গেই নিয়ে যেতে চাই। ইওরস ইজ এ ব্যাড ফ্যামিলি।

তপোব্রত পাশে এসে বসে ছেলের কাঁধে হাত রেখে বললেন, অত উত্তেজিত হোস না। তোর তো কোনোদিন চট করে এত মাথা গরম হতো না।

বুড়ান আমাকে কতটা অপমান করেছে জানো? উইদাউট প্রোভোকেশন?

বুড়ান তোকে উত্তেজিত করতেই চাইছে। যাতে তুই এবং আমি বিরক্ত হয়ে নিউ ইয়র্কে ফিরে যাই। তাতে বাড়ি বেচার সুবিধে হবে। ছেলেটা খারাপ কিনা জানি না, তবে অসৎ সঙ্গে পড়েছে। বোধহয় তেমন চালাকও নয়।

এদের সঙ্গে বাস করতে তোমার ঘেন্না হবে না?

এরা তো সবাই বুড়ান নয়। তুই বড় পরিবার কখনো দেখিসনি, তাই বুঝিস না। একটা মস্ত পরিবারে এরকম হরেক এলিমেণ্ট থাকে। এসব নিয়েই চলতে হয়। মাথা ঠাণ্ডা কর্। আমি একটু বারান্দায় যাই।

দেবব্রত আর কথা বাড়ালো না। কলকাতায় এবার একটু শীত পড়েছে। খুব বেশী নয়। তাহলেও চোরা ঠাণ্ডা টের পাওয়া যাচ্ছে বেশ। তপোব্রত নিজের ঘরে ফিরে যাওয়ার পর দেবব্রত গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে কিছুক্ষণ দেয়ালে একটা টিকটিকির দিকে চেয়ে রইলো। এরকম জীব ঘরে ঘুরে বেড়ায় তা তার অভিজ্ঞতায় ছিল না। অভিজ্ঞতা ছিল না মশার কামড়েরও।

খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে দেবব্রত মন থেকে গ্লানিটা ঝেড়ে ফেলার জন্যই লাফিয়ে উঠলো। ঘরের দরজাটা বন্ধ করে ব্যায়ামের পোশাক পরে নিজে অতি দ্রুত কয়েকটা শক্ত ফ্রি হ্যাণ্ড একসারসাইজ করে নিলো। কয়েকটা সামারসল্ট দিলো কার্পেটের ওপর। শরীরের জড়ভরত ভাবটা কেটে যাচ্ছিলো ধীরে ধীরে। ঘাম হতে লাগলো। কিছুক্ষণ শ্যাডো ফাইট আর স্কিপিং করলো সে। মেডিসিন বল আর হালকা যন্ত্রপাতি দিয়ে কিছুক্ষণ শরীরটাকে চাঙ্গা করল। এসব সে সঙ্গেই এনেছিল।

পরিশ্রমের পর স্নান করলো সে। তারপর ভীষণ খিদে পাওয়ায় সে একটা চিজের টুকরো শেষ করলো বসে বসে। ভাবতে লাগলো। সন্ধ্যের সময় সে কখনো ঘরে থাকে না। এখানে যাওয়ার জায়গা সে চেনে না এখনো, সঙ্গী নেই, মেয়ে-বন্ধু নেই, খেলার জায়গা নেই, জ্যাজ নেই—কিই বা সে করতে পারে?

দরজায় মৃদু একটু টোকা পড়লো।

উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেবব্রত দেখলো, শিবানী। মুখটা করুণ, কান্নায় চোখের কোল এখনো ভেজা। মুখে একটা ভীষণ অসহায়তার দাগ।

এসো শিবানী।

তোমার সঙ্গে কথা বলতেই এখন আমার লজ্জা করছে।

ওই স্কাউণ্ড্রেলটার জন্য? আরে যাঃ, ও সব বাদ দাও। আই হ্যাভ সাম একসারসাইজ অ্যাণ্ড ফিলিং ফাইন নাউ। তোমাকেও আমি নানারকম ব্যায়াম শিখিয়ে দেবো। ফিজিক্যালি ফিট না হলে মেণ্টাল ফিটনেসও আসে না। চীজ খাবে? হঠাৎ দেখলাম আমার স্যুটকেসে কয়েক কৌটো চীজ আছে। খুব ভাল চীজ।

খাই না, গন্ধ লাগে।

চীজের গন্ধ তো দারুণ ভাল।

হোকগে, সে তোমাদের নাকে।

তাহলে কৌটোগুলো নিয়ে তোমাদের ফ্রিজে রেখে দাও। আমাদের ফ্রিজ তো আসতে এখনো দেরি আছে। জাহাজ কবে এসে পৌঁছোবে কে জানে।

শিবানী সুটকেস থেকে নিজেই চীজের কৌটোগুলো বের করে নিয়ে ফ্রিজে রেখে দিয়ে এলো। বসলো দেবব্রতর মুখোমুখি চেয়ারে।

তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভীষণ ভালো লাগে। তুমি তো মজার লোক। আর সেটাকেই কেমন বিকৃত করে দিলো বল তো বুড়ান।

দেবব্রত দাঁতে ঠোঁট চেপে বললো, বাবা বলছিল বুড়ান আমাদের প্রোভোক করতে চাইছে এখান থেকে তাড়ানোর জন্য। কিন্তু আমার প্রশ্ন তোমরা ওকে অত ভয় পাও কেন ?

ওকে নয়। ওর দলকে। তুমি ওদের চেনো না। দত্তগুপ্ত ভীষণ জেলাস টাইপের, স্যাডিস্ট, রুমকিদি আর মৌলির জীবনটা নষ্ট করে দিলো কেমন ক্যাজুয়ালি। এখন মৌলিও যাবে। হয়তো বুড়ানকেই পাঠাবে মৌলিকে খুন করতে।

বাবা আমাকে নিউ ইয়র্কে পালিয়ে যেতে বলছে।

চলে যাবে তুমি ?

দেবব্রত একটু হেসে বললো, যদি যাই তবে বাবাকে রেখে যাবো না। তুমি তো জানো না, বাবাকে আমি কি ভীষণ ভালবাসি।

শুনেছি। জ্যাঠামশাইয়ের কাছে তুমিও অন্ধের নড়ি।

ইন ফ্যাক্ট. আমাদের দুজনের দুজন ছাড়া কেউ নেই। তাই বাবাকে রেখে যেতে ভরসা পাচ্ছি না।

কবে যাবে ?

কিছু ঠিক করিনি। মনে হচ্ছে থাকা যাবে না এখানে। কতগুলো ভেস্টেড ইণ্টারেস্টে লাগছে। উই আর নট ওয়াণ্টেড হিয়ার।

শিবানী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, তারপর হঠাৎ উঠে নিঃশব্দে চলে গেলো।

দেবব্রত ওকে পিছু ডাকলো না। মেয়েটা বড় ভাল।

॥ ছয় ॥

খবরটা প্রথম দিলো টুলু। একটু বেশী রাতের দিকে জানালায় টোকা দিলো সে। আমার জেলে যাওয়ার আগে দত্তগুপ্তর সাকরেদি করার সময়েও এইভাবেই রাত-বিরেতে সে খবর পৌঁছে দিয়ে যেতো। টুলু ঠিক মস্তান টাইপের নয়। সকলের ভিতর তো সব রকম জিনিস থাকে না। টুলু হচ্ছে ইনফর্মার টাইপের। বুদ্ধি ধারালো, চোখ অতিশয় সজাগ, বাতাসেও সে নানারকম গন্ধ পায়। বরাবর আমার ঘনিষ্ঠ ছিল।

জানলা খুলে বললাম, কিরে ?

বস, নিশ্চিন্তে বাড়িতে বসে আছো ! তোমার আক্কেল বলে কিছু নেই ?

কেন ?

গডফাদার কি চুপচাপ বসে আছে ভেবেছো ?

ওর সঙ্গে আর সম্পর্ক কিসের ?

খুব বোকা বনে যাচ্ছো দিন দিন। সময় থাকতে পালাও।

আমি তো লাইন ছেড়ে দিচ্ছি।

সেই সঙ্গে কি দুনিয়াও ছাড়তে চাও ?

দত্তগুপ্ত কি আমাকে ফুটিয়ে দিতে চাইছে ?

সেটাই তো ন্যাচারাল।

জানতাম।

তৈরি আছো ?

একটু ইতস্তুতঃ করে বললাম, সেরকম তৈরি নই। জেল থেকে বেরিয়ে কেমন ক্যালাস মেরে গেছি। মাথাটা খেলছে না।

আজ রাত্তিরটা বড় জোর সময় পেতে পারো। ট্যারা গুলে এখানে নেই।

নতুন কে উঠলো রে ?

অনেক। একটা হলো বুড়ান। বুধোর ভাই। চৌধুরী বাড়ির।

সেটা তো ভদ্র বাড়ি।

কার বাড়ি ভদ্র নয় বলো। লাইন হচ্ছে লাইন।

বুঝেছি। কাকে লাগাবে আমার জন্য জানিস ?

না। ওসব টপ সিক্রেট। শোনো, কাল সকালে বাড়ি ছেড়ে লাইনের ওপারে সন্তুর দোকানে চলে যেও। কালী আর মদনের সঙ্গে দেখা হবে। নান্নুর লোক।

জানি। কাউকে ভুলিনি।

ওদের ওখানে থেকে যেও। বাড়িতে বা পাড়ায় থেকো না।

তোর কি খবর ? দুদিকেই তাল রাখছিস নাকি ?

আমার তো কারো সঙ্গে ঝগড়া লাগলে চলবে না। সব দলেই আছি।

টুলু চলে যাওয়ার পর রাত্রে আমার ঘুম হলো না। দত্তগুপ্ত যে আমাকে সহজে ছেড়ে দেবে না তা আমি জানতাম। জেল থেকে বেরোনোর পরই আমার মনে হয়েছিল, এত চট করে ছাড়া পেলেও আসল জায়গায় রেহাই নেই। তবে নান্নুর উৎপাত থেকে দত্তগুপ্তকে বাঁচিয়েছি বলে একটু কৃতজ্ঞতা আশা করেছিলাম তার কাছ থেকে। পরে ভেবে দেখলাম, আমি না হলেও ক্ষতি ছিল না, দত্তগুপ্ত আর কাউকে খুনটা করার জন্য পাঠাত।

তবু ব্যক্তিগত নিরাপত্তার চিন্তার চেয়েও রুমকির চিন্তাই আমার মাথাটা জুড়ে আছে। সেদিন মাংসের দোকানে তাকে দেখেছি। ঠিক যেমন কাঙাল ভিখিরি মহার্ঘ জিনিসের দিকে চেয়ে থাকে, তেমনি ভাবে। রুমকিও আমাকে এক ঝলক দেখেছিল। চিনতে পারেনি। একথা সত্য হতে পারে না। কিন্তু চিনতে চায়নি। আমি যে একজন কেউ, এটাও যেন স্বীকার করলো না সে। তবে তার দ্রুত চোখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং ত্রস্ত হেঁটে চলে যাওয়ার মধ্যে ইঙ্গিত ছিল যে, আমি আজও তাকে উত্তেজিত করি।

সেই থেকে কেমন বোম-ভোলা হয়ে আছি। দিনরাত তার কথাই ভাবছি আর ভাবছি। আমার নিজের বিপদের কথা ভুল হয়ে গেছে।

টুলু আমাকে সাবধান করে দিয়ে গেছে বটে। কিন্তু লাইনের ওপারে সন্তুর দেকানে গিয়ে নান্নুর দলের সঙ্গে যোগাযোগ করা আমার কাছে পণ্ডশ্রম বলে মনে হচ্ছে। এই সব দলবাজি, ঝগড়া, মারপিট আমার কাছে এখন বিস্বাদ, অর্থহীন। কেন খামোখা আমি এসব করতে যাবো? রুমকি আমাকে হাত ধরে তুলে নিতে চেয়েছিল এক সুন্দর জীবনে। সত্যিকারের একটা কাজ দিতে চেয়েছিল যে কাজ অবলম্বন করে বেঁচে থাকা যায়, জীবন সুস্বাদু বলে মনে হয়। ওই পরিশ্রমী মেয়েটির সতেজ সান্নিধ্য আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এখন সে আমাকে রাস্তার পাগলা কুকুরের চেয়ে বেশী মূল্য দেয় না।

নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে কি হবে?

নিজের পরিবারে আমার কোনো আদর নেই, ভালবাসা নেই। তাদের চোখে ভয় বিরক্তি আর ঘেন্নার দৃষ্টি আমি নিয়ত অনুভব করি। হয়তো আমার উপস্থিতিই তাদের কাছে অস্বস্তিকর। মা নেই, থাকলে হয়তো একটু প্রশ্রয় পাওয়া যেতো। আমার জীবনটা মোটামুটি বিবর্ণ হয়ে গেছে। আর কিছু হওয়ার নয় আমার।

সকালবেলা উঠে অনেকক্ষণ নিজের ভিতরকার নিস্তেজ, নিবু-নিবু ভাবটা অনুভব করলাম। তারপর মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম, যা হওয়ার হবে। আর অ্যাকশন নয়।

ভেবে মনটা বেশ ঝরঝরে লাগলো। মরতে ভয় তো নেই ই, বরং বেশ আগ্রহ হচ্ছে। হত্যাকারী যেদিক থেকে যেভাবেই এসে হাজির হোক না কেন আমি মরবো বিনা প্রতিরোধে। সাগ্রহে।

দিনের প্রকাশ্য আলোয় আমি পাড়ার মধ্যে ঘোরাফেরা করলাম খানিকক্ষণ। এ পাড়ায় আমার চেনা লোক অনেক। অনেক কেন, সবাই। কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই আমাকে দেখলে চেনা লোকেরা

মুখ লুকোয়, পালায়, গা-ঢাকা দেয়। নিতান্ত সামনাসামনি পড়ে গেলে বা চোখাচোখি হলে বড় জোর দেঁতো হাসি হাসে। তবু দু-চারজনের সঙ্গে সামান্য কথাবার্তা হলো।

পাড়ার থমথমে ভাবটা আমি স্পষ্টই অনুভব করছি। বুঝতে পারছি আড়াল আবডাল থেকে অনেক কৌতূহলী চোখ আমাকে নজর করছে।

চিন্তামণির গানের স্কুলটার কাছ বরাবর হঠাৎ একটা বাচ্চা ছেলে দৌড়ে এসে আমার হাতে একটা কাগজ গুঁজে দিয়েই পালিয়ে গেলো। ছেলেটাকে দৌড়ে ধরতে পারতাম, ধরলাম না।

একটা ছেঁড়া কাগজ। তাতে ডটপেনে মেয়েলি ছাঁদে লেখা, একবার আমাদের বাড়ির পিছন দিককার গলির দরজায় আসবেন? এক্ষুণি। আমি অপেক্ষা করছি। শিবানী।

কে শিবানী? কার বাড়ি? আমাকে ভুল করে চিঠিটা দিয়ে গেলো না তো!

কাগজটা দলা পাকিয়ে পকেটে পুরলাম। মাথাটা খুব ভাল খেলছে না। একটু ক্যালাস মেরে গেছে। অনেকক্ষণ ভাবতে হলো। তারপর আচমকা ফ্রক পরা রোগা সুশ্রী একটি মেয়ের মুখ যেন মনে পড়ে গেলো। বছর পাঁচেক আগে দেখা। চৌধুরি বাড়ির মেয়ে। বুধোর বোন। কিন্তু সে কেন আমাকে ডাকবে? আমার সঙ্গে তার কিসের দরকার? বিশেষ করে যখন তারই ভাই বুড়ান দত্তগুপ্তের সাকরেদি করছে!

তবু পায়ে পায়ে দুটো গলি ঘুরে চৌধুরিদের বাড়ির পিছন দিকে হাজির হলাম। আমার কিছু আর হারাবার ভয় নেই, মৃত্যুভয় কেটে গেছে। তবে আর চিন্তা কিসের?

মেয়েটি অনেক বড় হয়েছে। দীঘল সুন্দর চেহারা, এক ঢল চুল, লাল একটা তাঁতের শাড়ি তার পরনে। পিছনের দরজা খুলে খুব আনমনে দাঁড়িয়েছিল।

সামনে হঠাৎ আমাকে দেখে একটু শিউরে উঠলো কি?

মৌলিদা!

একটু হাসলাম, তোমাকে ভাল মনে ছিল না। অনেক বড় হয়ে গেছো।

আপনাকে আমার ভীষণ দরকার।

বলো।

আপনি দোতলায় আসুন।

দোতলায়? কেন বলো তো।

বাড়িতে কেউ তেমন নেই। কথাটা জরুরী।

আমি একটু দ্বিধা করলাম। তারপর বললাম, চলো।

দোতলায় কোণের দিকে একটা ঘরে আমাকে নিয়ে হাজির করলো মেয়েটা। বললো, বসুন, আমি একজনকে ডেকে আনছি।

হেসে বললাম, বুড়ান নয় তো!

না। বুড়ান নষ্ট হয়ে গেছে মৌলিদা। আমরা তার হাত থেকে বাঁচতে চাই।

মেয়েটা চলে গেলো। আমি চেয়ারে বসে চোখ বুজে রইলাম।

পায়ের শব্দে চোখ তুলে দেখলাম, শিবানীর সঙ্গে একটা ছেলে। তার চেহারা দেখেই আমি সোজা হয়ে বসলাম। আমি শরীর চিনি। নিজে ওয়েট লিফটার ছিলাম। এ ছেলেটার শরীর একেবারে টাটার স্টিলে তৈরী। ব্যায়ামবীরদের মতো পেশীর বাহুল্য নেই। কিন্তু চ্যাপটা টান টান পেশীর বন্ধনে বাঁধা শক্ত মজবুত হাড় আর সমস্ত কাঠামোর মধ্যে লুকানো একটা তড়িৎগতির আভাস রয়েছে। এ শরীর এদেশে তৈরি নয়।

ইনি আমার এক দাদা। আমেরিকায় জন্ম, সেখানেই মানুষ। সবে এদেশে এসেছেন। এঁর নাম দেবব্রত চৌধুরি।

একটা দায়সারা নমস্কার করে বললাম, কুংফু ক্যারাটে জুডো? আর কি?

ছেলেটা হাসলো, মেইনলি টেনিস, সাঁতার, বক্সিং, মারশ্যাল আর্ট একটু আধটু। আপনার কি? কুস্তি?

না। ওয়েট লিফটিং। এদেশের আবহাওয়ায় শরীর ঠিক থাকে না। হয় শুকিয়ে যায়, নয়তো থলথলে হয়ে পড়ে। সাবধান থাকবেন।

শিবানী আমাদের দুজনের সাংকেতিক সংলাপ শুনে দুজনের মুখের দিকেই পর্যায়ক্রমে তাকাচ্ছিল। বললো, ওসব কি বলছো তোমরা?

আমি হেসে বললাম, শরীরের কথা। তুমি বুঝবে না?

শিবানী বললো, আপনারা দুজনে কথা বলুন, আমি একটু চা নিয়ে আসি।

মেয়েটা চলে গেলে আমি দেবব্রতর দিকে চেয়ে বললাম, কি হয়েছে? ও আমাকে ডেকে আনলো কেন?

দেবব্রত সোজা আমার দিকে চেয়ে বললো, আমি রুমকির সঙ্গে মীট করেছি। এ চানস মিটিং। আমার মনে হয়েছে রুমকি খুব আনহ্যাপী।

রুমকির প্রসঙ্গে আমার বুকে দূরাগত একটা পুজোর বাদ্যি শোনা গেলো। খুব ক্ষীণ।

আমি বললাম, তার জন্য আমিই দায়ী। রুমকি আমাকে একটা মস্ত সম্মান দিতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষ অবধি আমি সেটা অর্জন করতে পারিনি।

সেই মার্ডার কেসটার কথা বলছেন কি?

হ্যাঁ। আগে যা হয়েছে তা হয়েছে। কিন্তু রুমকির সঙ্গে অতটা এগোনোর পরও কাজটা করা আমার অন্যায় হয়েছিল। আমাকে এত কম সাজা দিয়ে খালাস করাটা সরকারের ঠিক হয়নি।

সেন্টিমেন্টাল হবেন না। আমার ধারণা রুমকির এখনো একমাত্র অবসেশন আপনি।

ও কি কিছু বলেছে?

না। আপনার নামও উচ্চারণ করেনি। কিন্তু লোনলিনেস আর হতাশার ভাবটা গোপনও রাখতে পারেনি।

খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাতে কিছু প্রমাণ হয় না। রুমকিকে আমি চিনি। কাজের মেয়ে। তার বাজে সেন্টিমেন্ট নেই। হৃদয় নিয়ে

সে মাথা ঘামায় না। পাঁচ বছর ধরে সে একটা বস্তা পচা প্রেমের স্মৃতি মনে রাখবে না।

প্রেম জিনিসটা কিরকম তা আমিও জানি না। আমি যেখানে মানুষ সেখানে ঠিক রোমান্টিক প্রেম নেই। রুমকির ব্যাপারটাও প্যানপ্যানে নয়। তার একজন সঙ্গী বা জুড়ির দরকার ছিল। আজও সেই জুড়ি তার জোটেনি।

আমি এসব শুনে কি করবো বলুন।

শুধু রুমকির কথাই নয়। আমি দত্তগুপ্তের কথাও জানি। হি ইজ এ স্মলটাইপ গডফাদার হিয়ার। বুড়ানকে আপনি চেনেন বোধহয়?

চিনি। যখন জেলে যাই তখন বোধহয় পনেরো ষোলো বছর বয়সের ছিল।

সে দত্তগুপ্তের খপ্পরে পড়েছে।

সবই জানি। খবর পেয়েছি।

আপনি কি জানেন যে, দত্তগুপ্ত মে প্ল্যান টু কিল ইউ?

মে নয়, হি হ্যাজ অলরেডি গিভন দা গ্রীন সিগন্যাল।

আপনার কি কিছু করা উচিত নয়?

মারদাঙ্গা? আমি মাথা নেড়ে বললাম, আমি আর ওর মধ্যে নেই। অনেক হয়েছে। আমি উৎসাহ পাই না।

মারদাঙ্গা বলতে বোমাবাজি নয়, ধরুন যদি পাড়ার লোককেই চাঙ্গা করে তোলা যায়, বোঝান যায়, প্রতিরোধ তৈরি করা যায়?

মাথা নেড়ে বললাম, এদেশের লোককে আপনি চেনেন না।

আমি জানি কাজটা সহজ হবে না।

সহজ তো নয়ই, অসম্ভব। এদের দোষও নেই, ছাপোষা লোক, প্রাণের ভয় বড় ভয়।

আপনার প্ল্যান তাহলে কি?

মাথা নেড়ে বললাম, কিছু না। জাস্ট ওয়েট করা। দত্তগুপ্ত একসময়ে এ লাইনে আমার গুরু ছিল। বেকার জীবনে তার কাছ

থেকে পেয়েছিও অনেক। লোকটা ভাল কি মন্দ জানি না. তবে গুড অর্গানাইজার। সৎপথে থাকলে ওই ধারাল মাথা দিয়ে অনেক কিছু করতো পারতো। সেই লোকটা এখন আমাকে ভয় খাচ্ছে, সরিয়ে দিতে চাইছে। তা চাক না। আমি কিছু করবো না। একটা বোমা বা কয়েকটা গুলি কিংবা পেটে বুকে চাকুর ফলা—এই তো! ঠিক আছে। আমি তৈরী।

দেবব্রত একটু অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বললো, আপনি তো দেখছি টোটালি ডিজেক্টেড!

টোট্যালি। আমার আর এ সব ভাল লাগছে না। মরতে পারলেই হয়তো একটা রিলিফ পেয়ে যাবো।

দেবব্রত একটু চিন্তিত মুখে চুপ করে রইলো। তারপর বললো, বুড়ান সম্বন্ধে আপনি তো সবই জানেন।

সব নয়। তবে খানিকটা। ওকে ফেরাতে চান?

চাই?

পারবেন না। দত্তগুপ্ত মানুষের মর‍্যালকে কি ভাবে নষ্ট করে দেয় আপনি জানেন না। বেকার ছেলে সব, বেশির ভাগেরই পকেট মানি নেই তারা যদি মাসে পাঁচশো, হাজার, দু তিন হাজার পর্যন্ত পেয়ে যেতে থাকে তবে তাদের কেমন অবস্থা হয়? দত্তগুপ্ত টাকা দেয়, বাহবা দেয়, মর্যাদাও দেয়। এদেশের ছেলেরা ডাকাতি, গুণ্ডামি, তোলা নেওয়া আর পাড়ায় দাপট দেখানোটাকে বীরত্ব বলে মনে করে। দত্তগুপ্তর লোক হলে পাড়ার বাবু, মুদি, নাপিত, ধোপা সবাই খাতির করতে থাকে। তবে ছেলেরা কেন ফিরবে বলুন। আপনি বিকল্প ব্যবস্থা করতে পারবেন?

ভেবে দেখিনি। এদেশের সোশিও ইকনমিক স্ট্রাকচার সম্পর্কে এখনো আমার ধারণা স্পষ্ট নয়।

ভেবে পার পাবেন না। তবে ব্যক্তিগতভাবে বুড়ান সম্পর্কে আপনারা একটা ব্যবস্থা করতে পারেন। ওকে আমেরিকা পাঠিয়ে

দিন। এখনো তেমন পচন ধরেনি ওর। একটু বাদ সাদ দিলে চলে যাবে। কিন্তু এদেশে রেখে পারবেন না।

কিন্তু সে তো লংটার্ম প্রোপোজাল। রাতারাতি তো হবে না।

তা বটে। আমার কিন্তু আর কোনো সাজেশন নেই।

আমি ভাবছিলাম আপনার সাহায্য পেলে হয়তো কিছু করতে পারা যেতো।

আমি অবাক হয়ে বললাম, আপনি ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে চান? কুংফু ক্যারাটে বক্সিং কোনো কাজে লাগবে না। একটি পিস্তলের গুলি কোথা থেকে এসে আপনাকে ছাঁদা করে দিয়ে চলে যাবে। ডোণ্ট বদার। দে আর সেট টু উইন দিস ম্যাচ। আজ উঠি।

শিবানী চা নিয়ে এলো। বললো, একটু দেরি হয়ে গেলো।

না দেরির কি? আমারও তো কাজ নেই?

শিবানী মুখোমুখি বসে বললো, এ পাড়ায় সবাই ভয় পাচ্ছে, আপনি আসায় এবার একটা গণ্ডগোল লাগবে।

চায়ে চুমুক দিয়ে স্তিমিত গলায় বললাম, লাগবে না। আমি কিছু করবো না। নাথিং।

ওরা কি তা বলে ছেড়ে দেবে?

না তো! ছাড়বে কেন?

তার মানে?

একটা বড় শ্বাস ফেলে বললাম, আমাকে ডেকে চা খাওয়ানোর মতো লোক যে এখনো এ পাড়ায় অবশিষ্ট আছে তা জেনে বড় ভাল লাগছে শিবানী।

শিবানী একটু চুপ করে থেকে বললো, আপনি কেমন অন্য রকম হয়ে গেছেন মৌলিদা!

কথাটা মেনে নিয়ে বললাম, হ্যাঁ, কেমন যেন হয়ে গেছি। আমিও টের পাই।

শিবানী কেমন এক করুণ নয়নে আমার দিকে চেয়ে রইলো। তারপর হঠাৎ বললো, আপনি কি রুমকিদিকেও ভুলে গেছেন ?

আবার সেই দূরাগত বাজনার শব্দ শুনলাম বুকে। মাথা নেড়ে বললাম, ভুলিনি। তবে মনে না রাখলেই ভাল হতো। আজ চলি। তোমাদের সমস্যার কোনো সমাধান আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়।

কেন নয় ? আমি তো ভেবেছিলাম পারলে আপনিই পারবেন।

না, আমি পারি না। আমি আর কিছুই পারি না।

এইটুকু বলে আমি উঠে পড়লাম। ওরা দুজন আমার দিকে নিস্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলো।

সমাজ ও সংসারে কিসে ভাল হবে, মানুষের কিসে মঙ্গল হবে, বিপথগামীকে কি করে পথে ফেরানো যাবে এ সব নিয়ে আমি কোনোদিনই ভাবিনি। আজই বা ভাবতে বসবো কেন ? পৃথিবীর প্রতি আমার আর কোনো দায় নেই।

রুমকিদের বাড়িটার দিকে একবার দূর থেকে তাকালাম। ওই দেখা যাচ্ছে ওদের ফ্ল্যাট। দুপুরে এখন রুমকি নেই। বাড়িটা ঝিমঝিম করছে রোদে।

চোখ ফিরিয়ে নিলাম। মানুষের কত স্বপ্নই ভেঙে যায়। রুমকি আমার জীবনে না এলে আজ জীবনের প্রতি এত উদাসীনতা আমার আসতো না।

পাড়ার রাস্তায় প্রকাশ্যে উদাস পায়ে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরে এলাম।

দুপুরে খাওয়ার পর একটু ঘুম পেয়েছিল। বোধহীন মাথায় ঘুম সহজেই আসে।

বিকেলে ছোটো বোন এসে বললো, কে একজন দেখা করতে এসেছে।

নিয়ে আয়।

যে এসে ঘরে ঢুকলো সে দেবব্রত।

আরে, কি খবর ? আসুন।

দেবব্রত আমার তক্তপোশের একধারে বসলো। মুখ গম্ভীর। আমার চোখে চোখ রেখে বললো, আপনি মরতে চাইছেন কেন?

মরতে চাইছি কে বললো?

চাইছেন না?

না তো! মরা আর বেঁচে থাকার মধ্যে এখন আর তফাৎ করতে পারছি না, এইটেই যা অসুবিধে।

সেটাও তো স্বাভাবিক নয়।

আমি স্বীকার করে বললাম, তা ঠিক। আমি খুব স্বাভাবিক জীবন যাপনও করিনি তো। কাজেই আমার মনোভাবও বোধহয় স্বাভাবিক স্তরে নেই।

কিন্তু কেন?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, জানি না। দুনিয়াটা একদম ছাইয়ের মতো বিবর্ণ, রসকষ নেই। কিরকম যেন লাগছে।

দেবব্রত খুব নিবিড় চোখে আমার দিকে চেয়ে থেকে বললো, রুমকিই তার কারণ নয় তো!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, কি হবে ও সব কথা তুলে?

দেবব্রত একটু চুপ করে থেকে বললো, মা আমাকে তার হাত ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল, আমি যেন বাঙালী এবং সবর্ণ ব্রাহ্মণের মেয়েকে বিয়ে করি।

প্রসঙ্গান্তরে একটু অবাক হয়ে বললাম, তাই নাকি?

হ্যাঁ। এখানে এসে আমি এই একজন মহিলাকে দেখে ডিসিশন নিয়ে ফেলেছিলাম।

বুকটা একটু ছলাৎ করলো কি? চুপ করে রইলাম।

দেবব্রত নিজেই বললো, রুমকির সৌন্দর্য কোথায় তা আপনার মতো আমিও জানি। এমন পরিষ্কার টানটান স্বভাবের মেয়ে বাঙালী সমাজে ক'টা আছে বলতে পারি না।

সে তো বটেই।

কথাটা কেমন শোনাল দেবব্রতর কানে কে জানে। তবে নিজের কণ্ঠস্বরের নিষ্প্রাণ, তেজহীন, অতল হতাশার প্রতিধ্বনি আমি নিজেই আমার শূন্য অভ্যন্তরে শুনতে পাচ্ছিলাম।

দেবব্রত বলল, আপনার সঙ্গে একসময়ে ওর একটা রিলেশন ছিল বলেই আমি ভাবলাম একবার আপনাকে আমার সিদ্ধান্তের কথা জানানো উচিত।

বিব্রত হয়ে বললাম, আমি! আমি তো আর এখন কেউ নই।

সেও জানি! আপনাদের সম্পর্কটা আর নেই। তবু আমার সৌজন্যবোধে একটু বাধল।

বেশ কষ্ট করে গলায় শব্দ তৈরি করতে হচ্ছিল কণ্ঠনালীতে কেমন যেন শুকনো ভাব। কষ্ট করেই বললাম, কারও না কারও সঙ্গে বিয়ে তো ওর হতই। আপনার সঙ্গে যদি হয় তাহলে ভালই। কাজ করতে মেয়েটা খুব ভালবাসে। আমেরিকা কাজের জায়গা, ও সেখানে ভাল থাকবে।

থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। রুমকির কাছে প্রস্তাবটা এখনো তোলা হয়নি। তবে আমি জানি ও আপত্তি করবে না। বাবা সামান্য আপত্তি করতেও পারেন, বয়সের জন্য। রুমকি হয়তো আমার সমান।

না, বড়।

কিছু যায় আসে না তাতে।

না, কি আর যায় আসে।

দেবব্রত আবার কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বলল, আপনার মতো আমিও ডিজেক্টেড। মাত্র কয়েকটা দিন থেকেই বুঝতে পারছি এই পরিবেশ আমার স্যুট করবে না। ছ্যাট রাস্কেল বুড়ান, হি ইজ সাব হিউম্যান। গডফাদারের গায়েও বোধহয় আঁচড় দেওয়া সম্ভব নয়।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, অসম্ভবও নয়। তবে কি লাভ তাতে? দত্তগুপ্ত যদি মরে তো ট্যারা গুলে উঠবে। তাকে সরালে আসবে কালী বা মদনা। একই খেলা চলতে থাকবে।

কেউ চালাবে। নিউইয়র্কে তোমার নিজের এস্টাব্লিশমেন্ট তৈরি করে নেবে। এত যার ক্ষমতা সে সব পারে।

আমি শাড়ির নকশা করি, ড্রেস বানাই না বড় একটা। আমার বিউটি পার্লারও আমেরিকার তুলনায় কিছুই নয়। এখানে তবু করে খাচ্ছি, ওখানে আমার ভাতে টান পড়বে।

নিই ইয়র্কের ফ্যাশন ওয়ার্ল্ড সম্পর্কে আমি তেমন কিছু জানি না বটে, কিন্তু এটা জানি যে, ওখানে গুণী মানুষ পড়তে পায় না। আর ভাতে টানের কথা বলছো! আমি কয়েক মিলিয়ন ডলারের মালিক। বাবা আমাকে আর দাদাকে অনেক টাকা দিয়েছেন। আমি নিজেও তোমার সঙ্গে হাত লাগাবো। দুজনে মিলে কিছু একটা করবোই।

শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে মুখ তুলল রুমকি। কেমন স্বপ্নাতুর মুখ, দূরগত চোখের দৃষ্টি। দেবব্রতর দিকে বহুক্ষণ চেয়ে রইল।

তারপর বলল, আমার এরকমই তো ইচ্ছে ছিল। একজন শক্ত-সমর্থ পুরুষ আমার পাশে থাকবে, কাঁধে কাঁধ দিয়ে দুজনে একটা কিছু করে তুলব। সেইটাই যে ভালবাসা এটা কেন এখানকার বোকা ছেলেমেয়েরা বোঝে না বলো তো! শুধু রোমান্স, শুধু ফেনানো কথা, শুধু আবেগ, ও কি ভালবাসা?

আমি এখানকার ছেলেমেয়েদের চিনি না রুমকি।

না চেনাই ভাল।

তুমি একটা কথা জানো?

কি কথা?

আমি মৌলির সঙ্গে দেখা করেছি!

হঠাৎ সমস্ত শরীরটা যেন এক পলকের জন্য কেঁপে গেল রুমকির। সামলে নিল চট করে। তারপর মুখটা আঁচলে মুছে বলল, কেন করলে?

আমি শুনেছিলাম ওর সঙ্গে তোমার একটা সম্পর্ক ছিল।

পাস্ট ইজ পাস্ট। ওকে কি কিছু বলেছো?

আমি যে তোমাকে বিয়ে করতে চাই সেকথা বলেছি।

কেন বলতে গেলে? ও কি আমার গার্জিয়ান? খুব অন্যায় করেছো।

মৌলিও তাই বলছিল। তবু আমার সৌজন্যবোধে একটু লাগছিল বলে বললাম। লাইক এ স্পোর্টসম্যান।

মৌলি নিশ্চয়ই খুশি হল!

না। শুধু বলল, গো এহেড।

ওইটুকু?

আরও অনেক কথা হয়েছে। বাট হি ইজ নাউ এ হিউম্যান রেক। যাকে ধ্বংসাবশেষ বলে আর কি।

জানি। যারা মানুষ মারে তাদের ওরকমই হওয়া দরকার। ওরকমই হয়।

তাই হয়তো হবে। কিন্তু মৌলিকে আমার খুব খারাপ লাগেনি। হি ইজ নট দ্যাট ব্যাড। যদি হত তাহলে এরকম সুইসাইড করতে পারত না।

ড্রয়িং বোর্ড থেকে একটা পেনসিল মেঝেতে পড়ে গেল। রুমকি সেটা কুড়োনোর চেষ্টা করল না। একটু বাদে বলল, সুইসাইড!

দেবব্রত একটু হাসল, অ্যামাউন্টিং টু সুইসাইড। দত্তগুপ্ত—দ্যাট গডফাদার—সে নাকি মৌলিকে খুন করাতে চায়। মৌলি তা জানে। কিন্তু হি ইজ ড্যুয়িং নাথিং টু সেভ হিজ অ্যাস। সরি, একটা মার্কিন স্ল্যাং মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু কথাটা আশা করি বোঝাতে পেরেছি।

পেরেছো।

রুমকি তার ড্রয়িং পেপার আর জিনিসপত্র খুব ধীর হাতে গোছাচ্ছিল। হঠাৎ বলল, গুণ্ডারা শেষ অবধি গুণ্ডাদের হাতেই মরে।

হ্যাঁ, কিন্তু ইচ্ছে করে নয়। মৌলি মরছে প্রায় স্বেচ্ছায়। ভেরি উইলিং টু মিট হিজ ডেথ।

রুমকি উঠল। পরিচারিকাকে ডেকে কি সব নির্দেশ দিল।

তারপর একটা চামড়ার বড় ব্যাগ তুলে নিয়ে বলল, চলো। রাত্ত হয়েছে।

দেবব্রত ঘড়ি দেখে বলল, মাত্র সাড়ে নটা। এখনো ঢের সময় আছে। পার্ক স্ট্রিটে কয়েকটা ভাল রেস্তরাঁ আছে শুনেছি। লেট আস গো, অ্যাণ্ড হ্যাভ ডিনার।

আজ থাক।

আমার প্রোপোজালটার তুমি এখনো জবাব দাওনি।

কি বলব ভাবছি। আমার মতো মেয়ের পক্ষে বিয়েটা একটা মস্ত ব্যাপার। অলমোস্ট এ কোশ্চেন অফ লাইফ অ্যাণ্ড ডেথ।

জানি। আমি তোমাকে একটা কথা দিতে পারি। কোনোদিন তোমার কোনো অসম্মান করব না।

তবু প্রস্তাবটার জবাব দিতে একটু সময় লাগবে। মনটাকে স্থির করে নিই একটু।

তোমার মন অস্থির কেন?

তুমিই তো দায়ী। হঠাৎ এরকম প্রস্তাব করলে, আমার ভিতরে ভূমিকম্প হয়ে গেল।

একটু হাসল দেবব্রত। বলল, আমার হয়তো এত তাড়াতাড়ি প্রস্তাবটা করা উচিত হয়নি। আরও একটু কোর্টশিপের দরকার ছিল। কিন্তু আমি আর এদেশে থাকতে পারছি না। নট উইথ দিস ফ্যামিলি। দে আর রটন।

সকলে নয় নিশ্চয়ই। শিবানী ভাল মেয়ে। বুধো খারাপ নয়।

কিন্তু বুড়ান?

আমি ওর কতটুকু আর জানি!

আমি জানি। যাক গে, যা বলছিলাম। আমার আর সময় নেই। তাই ভাবলাম স্ট্রেটকাট তোমাকে বলে ফেলি।

বলে ভাল করেছো। তুমি খুব ভাল ছেলে।

গাড়িতে উঠবার আগে দেবব্রত ফের বলল, বাড়িতেই ফিরবে? বাইরে কোথাও খেয়ে নিলে হত না?

রুমকি একটু ভাবল, তারপর বলল, চলো। আমার চেনা একটা দোকান আছে। কাছেই। পাঞ্জাবী দোকান, মাঝে মাঝে ওখান থেকে খাবার আনিয়ে খাই।

খেতে গিয়ে আর পাঁচটা কথা এসে পড়ল। একটু রাত হয়ে গেল তাদের।

ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি বেশ জোরে ছাড়ল রুমকি।

রুমকি।

বলো।

কবে জবাব দেবে?

কাল পরশুর মধ্যে।

কী জবাব দেবে, হ্যাঁ না না?

রুমকি একটু হাসল, বলল, সেটাও অ্যাডভানস বলে দিতে হবে বুঝি?

আমার ধৈর্য একটু কম। তাছাড়া বোধহয় দিস ইজ দি ফার্স্ট টাইম আই অ্যাম ইন লাভ। সিরিয়াসলি ইন লাভ।

রুমকি পাড়ার রাস্তায় বাঁক ঘুরছিল। হঠাৎ হাত তুলে ইশারায় চুপ করিয়ে দিল দেবব্রতকে।

সামথিং রং?

রুমকি উদ্বেগের গলায় বলল, এত তাড়াতাড়ি রাস্তাটা এত ফাঁকা হয়ে যায় না তো!

তাই তো দেখছি।

সব দরজা জানালা বন্ধ। বারুদের গন্ধ পাচ্ছো?

পাচ্ছি। বোধহয় সেই গ্যাং ওয়ার। লাইনের ওপার আর এপার।

তুমি নেমে যাও। আমি একটু ওদিকটা থেকে ঘুরে আসি গাড়ি নিয়ে।

পাগল নাকি! এর মধ্যে তুমি যাবে কেন?

রুমকি দেবব্রতর দিকে বিবর্ণ মুখে তাকাল, বলল, আমবাগানের দিকটা ভীষণ নির্জন। ওদিকটায়—

ওদিকটায় কী?

আমাকে একটু দেখে আসতেই হবে।

তাহলে লেট আস গো টুগেদার।

দেবব্রত, তুমি মৌলিকে কথাটা বলে ভাল করোনি।

কোন্ কথাটা?

ওই যে তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও।

হঠাৎ এখন ওকথা কেন?

কারণ আছে। বলছি।

রুমকি পাড়ার রাস্তাটা পার হয়ে অন্ধকার গলি ধরে কিছুক্ষণ গাড়ি চালাল, তারপর হঠাৎ গাড়িটা থামিয়ে তীব্র একটা হর্ণ দিল সে।

দেবব্রত গাড়ি ভাল করে থামবার আগেই লাফিয়ে নেমে পড়ল তারপর দৌড়াতে লাগল সামনের দিকে।

দত্তগুপ্তর তপোবনের ফটক থেকে মাত্র একশ গজ দূরে অন্ধকার রাস্তায় ধুলোয় পড়ে আছে মৌলি। রক্তে ভেসে যাচ্ছে পথ।

দেবব্রত হাঁটু গেড়ে বসে বুকটা দেখল। নাকে হাত দিল। তারপর দুই প্রচণ্ড হাতে মৌলির বিশাল ভারী দেহটা তুলে নিল বুকে।

ঘুরতেই রুমকির মুখোমুখি। হেডলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত রুমকির মুখ চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। রুমকি অস্ফুট গলায় বলল, তোমার প্রস্তাবটার জবাব দেবো?

দেবব্রত বিব্রত গলায় বলল, ওসব পরে হবে। এ এখনো বেঁচে আছে।

রুমকি মাথা নেড়ে বলল, জানি। বেঁচে ওকে থাকতেই হবে। নইলে ওকে আমি ছাড়ব নাকি?

প্লীজ রুমকি।

এসো, গাড়ি ঘুরিয়ে নিচ্ছি।

রুমকির গাড়ি উন্মাদ বেগে ছুটে যাচ্ছিল কলকাতার এক বড় হাসপাতালের দিকে।

দেবব্রত পিছনের সীটে মৌলিকে আগলে নিয়ে বসে। বারবার নাড়ী দেখছে, শ্বাস দেখছে। রক্ত মুছে নিচ্ছে রুমালে। এক একবার রুমকির দিকে তাকাচ্ছে। হাত কাঁপছে না রুমকির, বেসামাল হচ্ছে না, রুমকি সেরকম মেয়ে নয়।

কিন্তু দেবব্রত জানে রুমকি কেঁপে উঠেছিল। তার পেনসিল খসে পড়েছিল মাটিতে।

রুমকি তার প্রস্তাবের কী জবাব দেবে, দেবব্রত তাও জানে।

॥ আট ॥

কী ক্লান্তিকর এই জাগরণ! এ কি জেগে ওঠা? এ কি বেঁচে ওঠা? ধুস্, আমি তো মরে গেছি কবেই। দ্বিতীয়বার শুধু শরীরে মরতাম। কোনও দুঃখ বা করুণা হয়নি নিজের জন্য, ভয় হয়নি।

জানি, আমি বেঁচে থাকতে দত্তগুপ্তর শান্তি নেই। আমি যে কিছু করব না তা দত্তগুপ্ত জানে। কিন্তু আমি যদি সকলের চোখের সামনে এ পাড়ায় বসবাস করতে থাকি তাহলে লোকে জানবে যে, দত্তগুপ্তের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেও বেঁচে থাকা যায়। সেটা দত্তগুপ্তের খ্যাতির পক্ষে খুবই খারাপ উদাহরণ। হয় আমাকে মরতে হবে, নয়তো পাড়া ছেড়ে পালাতে হবে। আমার পক্ষে প্রথমটাই বেছে নেওয়া সহজ ছিল। বেঁচে থাকাটাই আমার কাছে যে কী বিড়ম্বনা!

রুমকির জীবন থেকে আমি মুছে গেছি, সেটা তো জানিই। রুমকিকে আর কেউ বিয়ে করবেই, তাও জানা কথা। তবু দেবব্রত যখন এসে বলল, সে রুমকিকে বিয়ে করছে তখন আমার বুকের মধ্যে

কী যেন নিবে গেল। একেবারেই অন্ধকার হয়ে গেল ভিতরটা। অনেকক্ষণ নড়তে পারিনি। আমার চারদিকে এক গর্জমান, বহমান পৃথিবী, কিন্তু আমি যেন শিলীভূত, স্পন্দনহীন। অনুভূতি নেই, বোধ লুপ্ত।

রাতের দিকে আমার অন্ধকার ঘরে এসেছিল আমার বোন টুলু।

তোকে কে যেন বাইরে ডাকছে।

কে?

জানি না, তবে বলে দিয়েছি তুই বাড়ি নেই। তবু দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন হলাম না। তবে টুলুর গলায় গভীর উদ্বেগ ও কাঁপন স্পষ্ট টের পেলাম।

বাতিটা জ্বাল টুলু।

থাক না নেবানো।

ভয় নেই। বাতি জ্বেলে তোদের লুডোর বোর্ডটা নিয়ে আয়। একটু লুডো খেলি।

টুলু বিস্ময়ে প্রায় পাথর হয়ে গেল। তারপর কী ভেবে নিয়েও এল লুডোটা।

তোর হঠাৎ লুডো খেলতে ইচ্ছে হল যে?

এমনিই।

আমরা ছক্কা চেলে দান দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম। কারোই মন নেই খেলায়।

শিবানী তোকে ডেকেছিল?

হ্যাঁ, তোকে কে বলল?

শিবানীই বলল, বুড়ানকে নিয়ে ওদের খুব ঝামেলা যাচ্ছে।

হ্যাঁ।

তোকে কিছু বলেছে?

বলেছিল। বুড়ানকে দত্তগুপ্তর খপ্পর থেকে বাঁচানোর জন্য।

আমি বলি কি দাদা, তুই কিছুদিন মধ্যমগ্রামে পিসির ওখানে গিয়ে থাক। আমরা সবাই তোর জন্য ভয় পাচ্ছি।

কেন, ভয়ের কী?

ভয় নেই? নানাজনে নানা কথা বলছে। দত্তগুপ্ত নাকি তোর ওপর ভীষণ ক্ষেপে আছে।

আমি লুডোর চেককাটা বোর্ডটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কী সুন্দর ছক! আমাদের জীবনটা ঠিক এরকম বাঁধা পথে চলে না।

টুলু উঠে গেল। কিছুক্ষণ পর ঘুরে এসে বলল, লোকটা এখনো আছে। সদর দরজা খুলে দেখলুম, নেই। তারপর ছাদে উঠে উঁকি মেরে দেখি, ডান ধারে ইলেকট্রিক বক্সটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে আর একটা ছেলে।

আমি উঠে জামাটা গায়ে দিয়ে বললাম, দাঁড়া, দেখে আসছি।

টুলু সভয়ে বলে উঠল, না না, তুই কেন যাবি?

কোনও জবাব না দিয়ে শুধু একটু ভ্রূকুটি করলাম।

তাতেই কাজ হল, এরা আমাকে এখনও ভয় পায়।

মেথর আসবার দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে ইলেকট্রিক বক্সের পাশে লোক দুটোকে দেখতে পেলাম। নীচু স্বরে কী যেন বলাবলি করছে। লক্ষ্য রাখছে চারদিকে।

ভয়ডর আমার এমনিতেও ছিল না। এখন আরও নেই। সোজা এগিয়ে গেলাম সামনে।

কী চাই?

ছেলে দুটো অবাক হয়ে তাকাল। তারপর সটান হয়ে দাঁড়াল। একজন বলল, সুধীরদা আমাদের পাঠিয়েছেন।

সুধীরদা! কোন সুধীরদা?

দক্ষিণ কলকাতা ব্যায়াম সমিতির সুধীর ঘোষ।

আমি একটু হতভম্ব হয়ে গেলাম। সুধীরদা আমার ট্রেনার ছিলেন। একসময়ে ন্যাশনাল মিট-এ তিনি ওয়েট লিফটিং-এ চ্যাম্পিয়ন

হন পরপর তিনবার। তারপর মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় হাত ভেঙে যাওয়ায় কম্পিটিশন ছেড়ে ট্রেনার হন। খুবই সফল ট্রেনার। আমাকে খুবই ভালবাসতেন। কিন্তু এসব তো বিগত জন্মের কথা। সুধীরদার তো আমাকে মনে থাকবার কথাই নয়।

ছেলেদুটোর দিকে এতক্ষণ ভাল করে চেয়ে দেখিনি। এবার দেখলাম, বেশ ভাল চেহারা। বোধহয় লাইট ওয়েটে লিফট করে। বললাম, হঠাৎ আমাকে সুধীরদার কী দরকার?

একজন পকেট থেকে ভাঁজকরা একটা কাগজ বের করে আমার হাতে দিয়ে বলল, চিঠি দিয়েছেন।

রাস্তার আলোতেই ছোট্ট চিঠিটা খুলে পড়লাম, স্নেহের মৌলি, তোমার জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে শুনলাম। খবর রাখতাম না। সেদিন তোমার পাড়ার একটি ছেলের কাছে শুনলাম। একসময়ে তুমি ভাল লিফটার ছিলে। যদি ট্রেনার হতে চাও তো আমার সঙ্গে দেখা কোরো। আমি এ ব্যাপারে কিছু ক্ষমতা পেয়েছি। তোমাকে সুযোগ করে দিতে পারি। এক সময়ে ওয়েট লিফটিং-এ বাঙালী ছেলেদেরই আধিপত্য ছিল। আজকাল আর নেই। আমার খুব ইচ্ছে একটা ট্যালেণ্ট হাণ্ট করে কিছু বাঙালী ছেলেকে তৈরি করি। যদি আগ্রহী থাক তো চলে এসো।

চিঠিটা পেয়ে তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া হল না আমার। সুধীরদার জীবনের একটা লক্ষ্য আছে, তিনি ভাবী ওয়েট লিফটারদের তৈরি করার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু আমার অন্ধকার অভ্যন্তরে কোনো স্বপ্নও যে আর অবশিষ্ট নেই!

একটু হেসে বললাম, সুধীরদাকে বোলো কাল বিকেলের দিকে যাবো।

ঠিক আছে। বলে ছেলে দুটো চলে গেল।

তাদের গমনপথের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম। দুই ভাবী ওয়েট লিফটার। সামনে ভবিষ্যৎ, স্বপ্ন, কিছু সাফল্যও হয়তো।

তবে এও ঠিক যে, যতদিন না মরছি ততদিন চুপচাপ বসে না থেকে কিছু করলেও হয়। সময়টা তো কাটবে।

পরদিন বিকেলে সুধীরদার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম। প্রায় সত্তর আশিজন ছেলেকে ট্রেনিং দিচ্ছেন কয়েকজন কোচকে নিয়ে। ভারী ব্যস্ত।

তারপর একফাঁকে এসে আমার পাশে একটা লোহার চেয়ারে ঘর্মাক্ত কলেবরে বসে বললেন, তুমি কি এখন বেকার?

একরকম তাই।

চাকরি তো ইচ্ছে করলেই করতে পারতে।

একটু হাসলাম। চাকরির চেয়ে আমার মস্তানীর রোজগার একসময়ে বেশীই ছিল। বললাম, হল আর কই?

সুধীরদা কাঁধের তোয়ালে টেনে মুখ আর হাতের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, আমার ট্রেনারের বড্ড অভাব। টাকাও কম। যদি রাজী থাকো তো আজ থেকেই লেগে যাও।

আমার টাকার অভাব আছে ঠিকই, কিন্তু টাকার জন্য চিন্তাও আমার নেই। টাকা দিয়ে আর আমার কী হবে? আমি জিজ্ঞেস করলাম, এতদিন বাদে হঠাৎ আমাকে আপনার কেন মনে পড়ল সুধীরদা?

সুধীরদা যেন একটু সংকুচিত হয়ে বললেন, তোমার মামলার কথা খবরের কাগজে পড়েছিলাম। তোমার জেল হল, তাও জানি। কাজেই তোমার কথা আমার হঠাৎ মনে পড়েনি, ইউ ওয়্যার ইন দি নিউজ। বাপী নামে একটা ছেলে তোমার পাড়ায় থাকে। সেও লিফটিং করে। তোমার কথা আমাকে সেই বলেছে।

কী বলেছে?

বলেছে তোমার এখন চাকরি-টাকরি নেই। খুব ডিপ্রেশনে আছো। তাই মনে হল, তোমাকে কোচিং-এর কাজে নামালে হয়তো ভালই হবে। তোমার কোনও আপত্তি নেই তো!

না, আপত্তি কিসের ?

সুধীরদা খুশি হলেন। আমিও যেন নিজের খোলস ছেড়ে বেরোনোর একটা রন্ধ্র পেয়ে গেলাম। অনেকদিন বাদে যন্ত্রপাতি নিয়ে নেমে পড়লাম প্র্যাকটিসে। বয়স আমার এমন কিছু গড়িয়ে যায়নি। লিফটিং এখনও মন্দ পারি না। গা দিয়ে গলগল করে ঘাম নামল, শরীরে ছুটতে লাগল আগুন। বহুকাল বাদে শরীরের মধ্যে ডুবে গিয়ে একটা মুক্তির স্বাদ পেলাম।

সুধীরদাকে বললাম, রোজ আসব।

এসো! আমার হ্যাণ্ডস বড় কম। বুড়োও তো হচ্ছি, পেরে উঠছি না।

সুধীরদার জিমনাসিয়্যামে যাতায়াত শুরু করে একরকম ভুলে থাকা গেল আমার অব্যবহিত চারপাশকে। আসলে ভুলে থাকার চেষ্টাও একটা ফ্রাস্ট্রেশন। বেঁচে থাকাটা একটা অভ্যাস মাত্র। যখন বেঁচে থাকার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় তখনও অভ্যাসবশে বেঁচে থাকতে গিয়ে মানুষ কত কিছু করে। আমার সেই অবস্থা।

তবু ভারোত্তলনের জগতে ফিরে গিয়ে একধরনের আকর্ষণ বোধ করতে লাগলাম। স্ন্যাচ, জার্ক, প্রেস ইত্যাদির সঠিক পদ্ধতি ছেলেদের হাতে কলমে দেখিয়ে দিই। নানারকম ব্যায়াম করাই। খাবারের চার্ট তৈরি করি। অনেকটা সময় এইভাবে ব্যস্ত রাখতে পারি নিজেকে। একজন এক্স কনভিক্ট এর চেয়ে বেশী আর কী আশা করতে পারে ?

না, এমন নয় যে, ভারোত্তলনের প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে আবার আমার আমি জেগে উঠল, সব হতাশা কেটে গেল, ফিরে পেলাম বাঁচবার ইচ্ছে। ওসব নয়। তবে শরীরের ওপর দিয়ে ঝড় বইয়ে আমি আমার মনটাকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলাম।

দিন সাতেক বাদে বুঝতে পারি, আর কিছু না হোক আমার শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে।

সকালে সেদিন বাজার করে ফিরছি, বাড়ির কাছাকাছি আসতেই দেখি সেই সেদিনের বাচ্চা ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে যে একদিন শিবানীর কাছ থেকে খবর দিতে এসেছিল।

মৌলিদা, শিবানীদি এই চিঠিটা দিলেন। বলেই ছেলেটা ছুটে চলে গেল।

চিঠিটা খুলে দেখি, মৌলিদা, ভীষণ দরকার। একবার আসুন।

বিরক্তি বোধ করি। বুড়ানকে নিয়েই বোধহয় আবার সমস্যা দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমি কী করতে পারি? আমার তো কিছু করার নেই।

তবু যেতে হল।

শিবানী শুকনো মুখে দরজা খুলে আমাকে দেখেই কাঁদতে লাগল। বলল, আপনি কিছু করবেন না মৌলিদা?

কী হয়েছে বলো তো!

ভিতরে আসুন। বলছি।

শিবানী আমাকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। বলল, বুড়ান যে কী করে বেড়াচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না।

কী হয়েছে অল্প কথায় বলো।

সেদিন যে আপনাকে ডেকে এনেছিলাম সেকথা ও জেনেছে। আমার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হয়েছে কাল। এমন জোরে থাপ্পড় মেরেছে বাঁ গালে যে এখনও আমার চোয়ালে ব্যথা।

তাহলে আবার ডাকলে কেন আমাকে?

ও জানতে চায় কেন আপনাকে ডেকেছিলাম।

তোমাদের পারিবারিক ব্যাপারে আমার তো কোনোও ভূমিকা নেই।

এটা শুধু পারিবারিক ব্যাপার আর নেই মৌলিদা, বুড়ানরা সব খবর রাখে, আপনি নাকি আবার কোন জিমনাসিয়ামে যাচ্ছেন। বলছিল, মৌলি ভাবছে আবার ব্যায়াম-ট্যায়াম করে ফিল্ডে নামবে। ওর হয়ে এসেছে, দত্তগুপ্তদা হুকুম দিয়ে দিয়েছে, ফিনিশ মৌলি।

আমি এ ব্যাপারটা অনেক আগেই আঁচ করেছিলাম। বুকটা একটু চমকে উঠল ঠিকই কিন্তু তা বলে ঘাবড়ানোরও কিছু নেই। একটা পরিণতি আমার অবিলম্বে দরকার। নইলে নিরালম্ব হয়ে স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করা এবং দিন গুজরান আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

শিবানী অনেক কথা বলছিল। আমি তার অধিকাংশই শুনতে পাচ্ছিলাম না। মন নেই বলে। বললাম, ঠিক আছে। মারতে হয় মারবে।

আপনার ওপর কত অবিচার হচ্ছে মৌলিদা! জেল খেটে এলেন, রুমকিদি বেঁকে বসল, এখন আবার এরা খুন করতে চাইছে। আপনি কেন অন্য কোথাও চলে যাচ্ছেন না?

আমি মানসিক অবসাদে হাল-ছাড়া গলায় বললাম, তাতে আমার বিশেষ লাভ নেই শিবানী। মরা বা বাঁচা এখন আমার কাছে সমান।

না না! ও কী বলছেন? আপনার যদি যাওয়ার জায়গা না থাকে আমি ব্যবস্থা করে দেবো। সল্ট লেকেই তো আমার এক মাসতুতো দাদার বাড়ি আছে।

আমি একটু হেসে ফেললাম। বললাম, আমাকে বাঁচাতে চাইছো কেন শিবানী? তুমি খুব ভাল মেয়ে। তবু বলি বেঁচে থেকে আমার আর কিছু লাভ নেই। ইচ্ছেটাই চলে গেছে।

হঠাৎ শিবানীর মুখ চোখ পাল্টে গেল। কাঁদছিল অল্পস্বল্প। এবার যেন উথলে উঠল, মুখচোখ কেমন যেন তীব্র হয়ে উঠল। তীক্ষ্ণ গলায় বলল, আপনার না থাক, আপনার বেঁচে থাকাটার দরকার আমার কাছে আছে। কেন মরবেন আপনি? এত সস্তা নাকি?

আমি একটু থতমত খেয়ে গেলাম। শিবানীর এই রূপান্তরটা আমার খুব স্বাভাবিক ঠেকল না।

আমি নিবিষ্ট চোখে ওর চোখ মুখের ভাবটা পাঠ করে নিয়ে ধীরস্বরে বললাম, শিবানী আমার ওপর কি তোমার কোনোও দুর্বলতা আছে?

শিবানী দু হাতে মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কাঁদল, তারপর মাথা নেড়ে বলল, আছে। ভীষণ আছে।

কবে থেকে ?

অনেকদিন থেকে।

বলোনি তো কখনো ?

কী বলব ? আমি ফ্রক পরা অবস্থা থেকে মনে মনে—। আপনি কি কখনো আমাকে পাত্তা দিতেন ? তার ওপর রুমকিদি। আমার কী করার ছিল বলুন তো।

আমি ধীর স্বরে বললাম, আমার মতো লোকের প্রতি দুর্বলতা থাকাটা ঠিক নয় শিবানী, ওটা ঝেড়ে ফেলতে হবে তোমাকে।

কেন ?

মৌলি আর নেই। আমি অনেকদিন আগেই মরে গেছি।

না, কখনো মরেননি। রুমকিদির কথা জানি না, কিন্তু আপনার সব জেনেও—

না শিবানী। শক্ত হও।

আমি তো আর কিছু চাই না, শুধু চাই আপনি বেঁচে থাকুন। আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন আমার দুর্বলতার কথায় ?

ভয় আমি নিজের জন্য পাচ্ছি না। তোমার জন্য পাচ্ছি। বুড়ান জানতে পারলে তোমাকে কাঁচা চিবিয়ে খাবে। আমার ওপর ওদের ভীষণ রাগ।

বুড়ানকে তো আমি মুখের ওপর বলেই দিয়েছি।

কী বলেছো ?

বলেছি যে আমি আপনাকে ভালবাসি। সেইজন্যই তো মারল।

আমি চমকে উঠে বললাম, সর্বনাশ।

কেন সর্বনাশ মৌলিদা ? কিসের সর্বনাশ ? কয়েকটা বাজে নিষ্ঠুর পাজি লোক চিরকাল যা খুশি করে যাবে আর সবাই মিলে মুখ বুজে সহ্য করে যাবো—এ কি হয় ?

আমি মৃদু হেসে বললাম, ওদের দলে যে আমিও ছিলাম শিবানী। আমিও খুব বাজে লোক।

মোটেই নয়।

ম্লান হেসে বললাম, ভালবাসা জিনিসটা মানুষকে অন্ধ করে দেয়। আমার প্রতি দুর্বল বলেই তুমি আমার খারাপ দিকটা দেখেও দেখনি।

আপনি কতটা খারাপ বলুন তো! আপনার পক্ষে খুব বেশী খারাপ হওয়া সম্ভবই নয়। আর খারাপ হলে রুমকিদির মতো মেয়ে আপনার সঙ্গে মিশত না।

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস চাপা দিলাম।

শিবানী হঠাৎ বলল, সব জানেন তো!

কিসের কথা বলছ?

রুমকিদি আর দেবব্রতর কথা!

জানি। ভালই হবে শিবানী।

ছাই হবে। দেবব্রতর চেয়ে রুমকিদি বয়সে বড়।

একটু হাসলাম। কিছু বলার নেই।

রুমকিদি ভুল করছে।

রুমকি যা করে তা হিসেব কষেই করে। ভুল করবে না।

এটা ভুলই। একে বিকৃতি বলা যায়।

যতদূর জানি দুর্বলতাটা রুমকির যতটা, দেবব্রতরও ততটা।

দেবব্রতরই বেশী।

ওসব কথা থাক শিবানী। আমি উঠি।

না, এখনই না। আমার কথা শেষ হয়নি।

আবার কী কথা? বলেই হেসে ফেললাম।

কেমন করে হাসি আসছে আপনার বলুন তো! যার মাথার ও খাঁড়া ঝুলছে সে ওরকম করে হাসতে পারে নাকি?

পারে।. আমার মতো অবস্থা যার সে পারে। তুমি বুঝবে না।

শিবানী আমার চোখে চোখ রাখছিল না। দুর্বলতার কথা ব্য

করে ফেলার পর এখন লজ্জা পাচ্ছে। মাথা নত করে বলল, পায়ে পড়ি মৌলিদা, আপনি পালিয়ে যান।

পালিয়ে পালিয়ে হদ্দ হয়ে যাবো শিবানী, কিন্তু পালাবো কেন তার অর্থটাই নিরর্থক হয়ে যাচ্ছে। খামোখা কেউ পরিশ্রম করে ?

অত শক্ত কথা আমি বুঝি না। আমি শুধু চাই আপনি বেঁচে থাকুন। তার বেশী কিছু চাই না।

শুধু আমি বেঁচে থাকলেই হবে ?

আপাততঃ তাতেই হবে।

ধরো না হয় বেঁচেই রইলাম, তারপর কী হবে ?

এবার শিবানী আমার চোখের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বলল, মৌলিদা, আমি জানি আপনি রুমকিদিকে ভীষণ ভালবাসেন। আমি আপনার কাছে কেউ নই। আমাকে এত খারাপ ভাববেন না যে রুমকিদি দেবব্রতকে বিয়ে করলে তার জায়গাটা দখল করতে হামলে পড়ব। ভালবাসা ওরকম নয়।

শিবানীর এই কথাটা আমার এত ভাল লাগল যে, চোখে জল এসে গেল। মাথা নেড়ে বললাম, তোমাকে আমি একটুও খারাপ ভাবিনি। তবে ঠাট্টা করছিলাম মাত্র। তুমি বিশ্বাস করো, এখন কারও ভালবাসার মূল্য দিতে পারার মতো সামর্থ্যও আমার নেই, আমি এত অপদার্থ।

মূল্য কি কেউ চেয়েছে ? যদি এতসব না ঘটত তাহলে কোনোদিনই মুখ ফুটে কথাটা আপনাকে বলতাম না। বয়স যখন অল্প ছিল, যখন আপনি রুমকিদির প্রেমে পড়েননি, তখন কাঁপা কাঁপা হাতে একটা কি দুটো চিঠি লিখেছিলাম আপনাকে, তাতে নিজের নাম দিইনি।

চিঠির কথায় হেসে ফেললাম। মনেও পড়ল। সত্য বটে, সে সময়ে ওরকম গোটা দুই চিঠি পেয়েছিলাম। মাথা নেড়ে বললাম, মনে আছে। কিন্তু নাম দাওনি কেন ?

পরের চিঠিটায় দিতাম। মনে মনে ঠিকও করে রেখেছিলাম। কিন্তু চিঠিটা আর লেখাই হল না। রুমকিদি এসে গেল মাঝখানে।

তাই হার মেনে নিলে ?

না। যুদ্ধের ভাষায় ওকে বলে স্ট্রাটেজিক রিট্রিট। আসলে হার-ই। তখন মনে হত, ভাগ্যিস চিঠিগুলোয় নাম দিইনি। দিলে মৌলিদা নিশ্চয়ই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করত।

মাথা নেড়ে বললাম, এমনও তো হতে পারত, চিঠিতে নাম থাকলে আমি হয়তো তোমার প্রেমেই পড়ে যেতাম।

শিবানী কথাটা বিশ্বাস করল না। গম্ভীর গলায় বলল, আপনি আজও আমাকে সিরিয়াসলি নিচ্ছেন না। জানি মৌলিদা, আমার সাধ্যই ছিল না আপনাকে দখল করি।

তুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। তারপর শিবানী বলল, আপনি যদি এখান থেকে আজই না পালান তাহলে কিন্তু আমি বিষ খেয়ে মরব।

চমকে উঠে বললাম, পালাব ? পালালে বাঁচা যাবে বটে, কিন্তু সমস্যাটার সমাধান হবে না।

কোন সমস্যার সমাধান ? দণ্ডগুপ্ত আর বুড়ান ? সে তো আপনি আগেই বলে দিয়েছেন যে আপনি পারবেন না। আমিও ভেবে দেখেছি ওসব খুনে গুণ্ডার সঙ্গে আপনার ঝগড়া কাজিয়ায় যাওয়া ঠিক নয়।

এবার আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, তুমি যদি চাও তবে—

বলে থামলাম। জানি কথাটার মানে হয় না। শিবানী চাইবে না।

কী চাইবো বলুন তো ?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, কিছু নয়।

শিবানী হঠাৎ উঠে এসে আমার তু কাঁধে নিঃসঙ্কোচে হাত রাখল। আমার মুখের দিকে চেয়ে গাঢ় স্বরে বলল, বলুন।

আমি ভারী মায়া বোধ করলাম মেয়েটার জন্য। এসময়ে ও ভালবাসার কথাটা না বললেও পারত। আমিও পাল্টা ওর কাঁধে হাত রাখলাম। তারপর বললাম বুড়ানের জন্য আমি দত্তগুপ্তর কাছে যেতে পারি।

শিবানী একটু শিউরে উঠে সরে গেল। তারপর বলল, কী বলছেন যা তা? আপনাকে ওরা খুঁজছে।

শোনো শিবানী, দত্তগুপ্ত এখনো আমাকে একটু সমঝে চলে। কেন চলে জানি না। আমার সঙ্গে ওর অনেক হিসেব-নিকেশ বাকী। আমি গিয়ে সামনে দাঁড়ালে দত্তগুপ্ত খুব স্বস্তি বোধ করবে না।

আপনাকে আর বীরত্ব দেখাতে হবে না। খুব হয়েছে। আমাকে ছুঁয়ে বলুন পালাবেন! আজই।

আজই?

আর যে সময় নেই।

ঠিক আছে।

ঠিক তো? কথার নড়চড় হবে না?

না।

যাওয়ার আগে কোথায় যাচ্ছেন তা কাউকে বলবেন না যেন?

অবাক হয়ে বললাম, তুমি আমার জন্য অনেক ভেবেছ শিবানী।

ভাববারই তো কথা।

আমার জন্য এখন আর কেউ ভাবে না। আমার পরিবারেরও কেউ না।

শিবানী খুব ফিকে একটু হাসল। অন্তর্গত দুশ্চিন্তার ছাপ সেই হাসির ভিতর দিয়ে যেন বড্ড বেশী প্রকট হচ্ছিল।

বিদায় নিয়ে চলে আসবার সময় মনটা খারাপ লাগছিল খুব। আমাকে ভালবাসা শিবানীর উচিত হয়নি। মেয়েটা কষ্ট পাবে। খুব কষ্ট পাবে।

আমাকে যে পালাতে হবে এটা ভাবতেও আমার ভীষণ অপমান

লাগছিল। একবার পালালে পালানোরও তো শেষ থাকবে না। নিতান্ত একটা মতলববাজ লোকের হিংস্রতা থেকে আত্মগোপন করে কাপুরুষের মতো বেঁচে থাকাটাই যে ভীষণ অবমাননাকর।

তবু বাড়ি ফিরে এসে অনিচ্ছুক হাতে আমি আমার সামান্য জিনিসপত্র একটা ব্যাগে গুছিয়ে নিলাম। বেঁচে থাকতে হবে, কিন্তু কার জন্য বাঁচব তা বুঝতে পারছি না। শিবানীর প্রতি আমার তো কোনও প্রেম নেই। রুমকি দেবব্রতকে বিয়ে করে আমেরিকা চলে যাবে, ঠিক কথা। কিন্তু তার শূন্য জায়গা তো আর কোনও মেয়ে ভরাট করতে পারবে না। শূন্যতাটা নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে। কিন্তু কোথায় পৌঁছোবো আমি? কী হবে আমার পরিণতি?

বিকালে জিমন্যাসিয়ামে যাওয়ার সময়ে বেরিয়ে পড়ব ব্যাগ নিয়ে। এইরকমই স্থির করলাম। বাড়িতে বলে রাখলাম কয়েকদিনের জন্য একটু বাইরে যাচ্ছি।

এ ঘোষণায় আমার বাড়ির লোকেরা একটু স্বস্তিই বোধ করল বোধহয়। মূর্তিমান বিপজ্জনক একটা খুনিয়া ছেলে বাড়িতে বসে থাকলে তাদের অস্বস্তিই হওয়ার কথা। হচ্ছেও।

বিকেলে ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

প্ল্যানমাফিক সব ঠিকঠাক ঘটে যাচ্ছিল। মিনিট পাঁচেক আগে বেরিয়ে পড়লে ঘটনার আবর্ত থেকে আমি নিরাপদে বেরিয়ে যেতেও পারতাম। কিন্তু তা হল না। আমার জীবনে কোনও নাটকীয়তা নেই এখন। নিতান্তই নিরুত্তাপ, বিষণ্ণ, স্থির জীবন। যেন এঁদো একটা কুয়ো। শ্যাওলাধরা, অব্যবহৃত, অন্ধকার, শীতল।

আমাদের পাড়ার অপরিসর রাস্তাটিতে কয়েকটা বাঁক আছে। আচমকাই সামনে একটু দূর থেকে একটা শক্তিশালী মোটরবাইকের আওয়াজ শুনতে পেলাম। বেশ ঝোড়ো গতিতে আসছে। মোটরবাইক এই রাস্তায় প্রায়ই যাতায়াত করে। নতুন কিছু নয়। সম্ভবত দত্তগুপ্তর চেলাচামুণ্ডারাই ঘুরে বেড়ায়। তাদের হাতে এখন প্রচুর পয়সা'।

প্রথম বাঁকটার মুখেই মোটর বাইকটার সঙ্গে আমার দেখা হল। কালো চশমাপরা একটা লম্বা ছেলে সওয়ার। বাইকটা প্রায় সার্কাসের মতো কেৎরে শুয়ে পড়ে বাঁকটা পার হল। আর তখনই সওয়ার ছোকরাটা একটা খিস্তি ছুঁড়ে দিয়ে গেল আমার দিকে।

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। এ পর্যন্ত আর যাই হোক, দত্তগুপ্তর চেলারা আমাকে প্রকাশ্যে গালাগাল করেনি। এখন করছে। তার মানে কি আমাকে উত্তেজিত করতে চাইছে? উত্তেজিত হয়ে আমি কিছু করে বসি কিনা দেখতে চাইছে? তাতে কি ওদের কাজের সুবিধে হবে?

গালাগালকে দুভাবে নেওয়া যায়। নির্বিকার দার্শনিক ভাবে, গায়ে না মেখে। আর নইলে উত্তেজিত হয়ে রি-অ্যাক্ট করে। আমার পক্ষে প্রথমভাবেই নেওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তা হল না। গালাগালটা শুনেই কেন যেন আমার রক্ত নেচে উঠল। মনে হল, আমি তো পালাচ্ছি। কিন্তু পাড়া শাসনের ভার তো এদের হাতেই। এদের হাতেই এতগুলো নিরীহ মানুষের প্রাণ ও নিরাপত্তা। সবচেয়ে বড় কথা এ পাড়ার তরুণ প্রজন্মের অনেক ছেলেকেই চাকরিহীনতার সুযোগে দত্তগুপ্ত নিজের দলে টেনে নিয়ে নষ্ট করছে। এইসব ছেড়ে আমি চলে যাবো।

না, তেমন কিছু করার ইচ্ছে আমার ছিল না। আমার শুধু ইচ্ছে হল, মোটর বাইকের সওয়ার ওই উঠতি মস্তানকে একটু কড়কে দিয়ে যাই। মৌলি মরে গেছে বটে, কিন্তু তবু এখনও তাকে তার পাড়ার মধ্যেই এত সহজে যে অপমান করা উচিত নয়, শুধু সেটুকু বুঝিয়ে দিয়ে যাওয়া।

আমি বাড়ি ফিরে এসে ব্যাগটা রেখে বেরিয়ে পড়লাম।

দত্তগুপ্তের তপোবনের গুপ্ত ফটকে এসে দেখলাম, ফটক বন্ধ। তবে ফটকের ওধারে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। আমার দিকে বিস্ফারিত চোখ। খুব অবাক হয়েছে দেখে।

আমি ফটকের কাছে গিয়ে ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলাম, একটু আগে একটা ছেলে—কালোমতো, চোখে গগলস, মোটরবাইকে এল। সে কে বলো তো!

ছেলেটা বিস্ময় সামলে নিয়ে কঠিন হয়ে বলল, কেউ হবে। কী দরকার?

আমি তার নামটা জানতে চাই।

নাম ফাম বলতে পারব না।

গলায় যথেষ্ট তেজ এবং বেপরোয়া ভাব।

ফটকটায় হাতের ভর রেখে প্যারালাল বারের মতো শরীর শূন্যে তুলে আমি বেড়ালের মতো লাফ দিয়ে ভিতরে নামলাম।

ছেলেটা চোখের পলকে কী একটা অস্ত্র পকেট থেকে টেনে বের করল। আমি সেদিকে তাকালামই না। একটি হাতুড়ির মতো ঘুঁষি মেরে শুইয়ে দিলাম। চোঁয়ালে হাড় ফাটার আওয়াজ হল কি? বোধ হয়। ছেলেটা পড়ে রইল। নড়ল না।

ভিতরে সেই চমৎকার গাছপালা, হরিণ, পুকুর, ফুলের বাগান। শান্ত, সমাহিত ভাব। প্রচুর ঝোপঝাড় থাকায় গা ঢাকা দেওয়ারও অসুবিধে নেই। জায়গাটা আমার নিজের হাতের তেলোর মতো চেনা।

রাগে অন্ধ আমি নই। আমার মগজ ক্যালকুলেটারের মতো কাজ করছে। ভয় নেই বলে বুকের ধুকপুকুনিও নেই। হাত পা স্টেডি টানটান।

মোটর বাইকটা দত্তগুপ্তর কুটিরের ধারে দাঁড় করানো। ধারে কাছে কেউ নেই। কুটিরের একটু পিছনে, অন্তত ত্রিশ ফুট তফাতে একটা পাকা দালান। একতলা। এটা বোধহয় নতুন হয়েছে। চেলাচামুণ্ডারা আড্ডা মারে। ওই ঘরের ভিতর থেকে কথাবার্তা আসছিল। আমি জানি, এ সময়ে দত্তগুপ্ত একাই আছে। একটু বাদেই গাছে জলটল দিতে বেরোবে। তার আগেই ওর ঘরে ঢোকাটা দরকার।

ফাঁকা জায়গাটা আমি নিঃশব্দে পার হয়ে দত্তগুপ্তর কুটিরের বারান্দায় উঠলাম। দরজাটা খোলাই। ভিতরে দত্তগুপ্ত একজন

মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। মেয়েটা কোনও গণ্ডগোলে পড়েছে নিশ্চয়ই। দত্তগুপ্ত গণ্ডগোলেরই সুযোগ নেয়।

আমি দরজা দিয়ে ঢুকলাম ভৌতিক গতিতে। দত্তগুপ্ত উঠবার বা তাকাবার সময় পর্যন্ত পেলনা। পেলে কী হত কে জানে।

এক হাতে মাথার ঝুঁটিটা ধরে টেনে তুলেই পেটের ওপর ঘুঁষিটা চালিয়ে দিলাম। কোনও চিন্তা না করে এবং হুঁশিয়ারি না দিয়ে।

ঘুঁষিটা মেরেই টের পেলাম, দত্তগুপ্ত বুড়ো হয়েছে। শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বলতে কিছু নেই। ঘুঁষিটা লাগতে না লাগতেই আমার বাঁ হাতে ধরা তার শরীরটা নেতিয়ে পড়ল। ছেড়ে দিতেই সেটা রবারের খোলসের মতো পড়ে গেল মেঝেয়।

মেয়েটা হাঁ, তার দিকে চেয়ে শান্ত গলায় বললাম, কোনও চেঁচামেচি না করে চুপচাপ বেরিয়ে বাড়ি চলে যান।

মেয়েটা বোধহয় ঘটনার আকস্মিকতায় নড়তেও পারছিল না। বুঝতে এবং উঠে চলে যেতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। দেখলাম, মেয়েটা বাইরে বেরিয়েই ছুটতে লাগল। আমি দরজা এঁটে দিলাম।

মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিতে দত্তগুপ্ত চোখ খুলল। তারপর উঠেও বসল। আমার দিকে ভাসা ভাসা চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে স্খলিত গলায় বলল, মারতে এসেছিস ?

হ্যাঁ, জানে শেষ করব তোমাকে। কিন্তু তার আগে দুটো কথা আছে।

কী কথা ? তোর সঙ্গে কথা কিসের ? ট্রেটার।

আমি ট্রেটার ? না তুমি ?

দত্তগুপ্ত মাথা নেড়ে বলল, তুই।

দ্বিতীয় ঘুঁষিটা দত্তগুপ্তর মাথায় লাগল। ছিটকে পড়ে গেল চৌকির ওপর। তারপর গড়িয়ে মেঝেয়।

জান বটে দত্তগুপ্তর, দু' দুটো ঘুঁষিতে ওর বয়সী যে-কেউ মরে যেতে পারত। কিন্তু দত্তগুপ্ত মরল না। বরং আবার

জলের ঝাপটা দিতেই কিছুক্ষণ বাদে চোখ মেলল। তবে উঠে বসতে পারল না।

চাপা গলায় বলল, মার।

তোমার প্রাণের ভয় নেই?

অনেক মেরেছি, যখন লোকে মানুষ মারে তখন তারও মরণ লেখা হয়ে যায়।

ফিলজফি ঝাড়ছো শালা বুড়ো ভাম? বয়স হলে মানুষের মন অন্যরকম হয়, তুমি শালা যেমন ছিলে তেমনি রইলে।

তোরা অন্যরকম হতে দিলি কই? আমি ভোল পাল্টাতে চাইলেই কি পারি? পাপের বেতন দিতে হয় না?

পাপের বোধ তোমার কবে থেকে হল শুয়োরের বাচ্চা?

দত্তগুপ্ত চোখ বুজল। হাঁফাচ্ছিল, কিছুক্ষণ দম নিয়ে বলল, আজ তোর দিন।

বটেই তো। তোমার দিন শেষ হয়ে গেল আজ।

দত্তগুপ্ত চোখ মেলল, বলল, আমার দিন অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে রে গাড়ল। তুই কি ভাবিস অর্গানাইজেশন আমিই চালাই?

তবে কে চালায়?

ওই ট্যারা গুলে, বুড়ান, খোকন, ওরা সব। আমাকে আমার পাওনাটা দেয়, আর বুদ্ধি পরামর্শ নেয়। পারবি ওদের সঙ্গে?

আগে তোমাকে তো নিকেশ করি, তারপর ওদের ব্যবস্থাও করব।

তুই কি পাড়ার ভাল করতে লাগলি? পাগল! ওভাবে হয় না।

কিভাবে হয়?

গোটা শহর, গোটা দেশ পচা, তুই পাড়াটার কী ভাল করবি? দত্তগুপ্ত তো সকলের চোখের সামনে, পুলিসের নাকের ডগায় বসে গত ত্রিশ বছর খচরামি করে যাচ্ছে। দেশটা যদি ভালই হতে চায় তো পারতো দত্তগুপ্ত? ওরাই পোষে আমাদের। তোকেও, আমাকেও।

কারা পোষে?

পুলিস, সরকার, পাবলিক সবাই।

তোমার অস্ত্র কোথায় থাকে ?

দত্তগুপ্ত উঠে বসল। তবে অতি কষ্টে। অবাক হয়ে বলল, কিসের অস্ত্র ?

তোমার রিভলভার, স্টেনগান, হাতবোমা ?

আজকাল ছুঁই না ওসব, দরকারও হয় না। নিজের হাতে করিও না কিছু বহুদিন। তবে ওই আলমারির দেরাজে একটা পিস্তল ছিল, আছেও বোধহয় এখনও। কার্তুজ নেই অবশ্য। জিনিসটা সুন্দর বলে রেখে দিয়েছি।

পিস্তলটা বের করে আনলাম। সত্যিই সুন্দর জিনিস। গ্রিপের ভিতর দিয়ে কার্তুজের ক্লিপ ভরতে হয়। স্প্রিং অ্যাকশনে কার্তুজ চেম্বারে ঢুকে যায়। এগারো শটের পিস্তল। বেশ ভারী।

নিবি ? নিতে পারিস। তোর হয়তো দরকার হবে। পাড়ার ভাল করতে চাস তো ! ওটা দিয়ে যদি পাড়ার ভাল হয় তো নিয়ে যা।

কথাটায় যেন ছ্যাঁকা লাগল আমার। পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললাম, পাড়ার ভাল এমনিতেই হবে, পিস্তল ছাড়াই। তুমি মরলেই হবে।

তবে মারছিস না কেন ?

বলেই দত্তগুপ্ত চোখ বুজল। বুঝলাম শরীর দিচ্ছে না। দু দুটো ঘুঁষির বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া কাজ করছে।

বললাম, ওঠো দত্তগুপ্ত।

কোথায় ?

চলো। পাড়ার লোকের কাছে তোমার কিছু কবুল করার আছে।

কী কবুল করবো ?

ওঠো, আগে বাইরে চলো। তারপর বলব।

আমাকে বেইজ্জত করতে চাস ?

চাই। তার চেয়ে বেশী আনন্দ আমার আর কিছুতে নেই।

দত্তগুপ্ত মাথা নেড়ে বললো, বড্ড বাড় বেড়েছিস, কিন্তু সামলাতে পারবি না।

মরার ভয় দেখাচ্ছো? শুনলাম নাকি আমার ডেথ ওয়ারেণ্ট তুমি এর মধ্যেই সই করে দিয়েছো! তবে আর ভয় কিসের? মরিই যদি তবে মেরেই মরবো না হয়। ওঠো!

দত্তগুপ্তকে টেনে তুলে দাঁড় করালাম। ওর শরীর কাঁপছে।

আমার হার্টের অবস্থা ভাল নয় রে। একটা ওষুধ খেয়ে নিতে দে। তারপর যাচ্ছি।

ছেড়ে দিয়ে বললাম, খাও। যত খুশি ওষুধ খেয়ে নাও। বাধা নেই।

দত্তগুপ্ত কেমন যেন থরথর করে কাঁপছিল। বোধহয় হার্ট সত্যিই ভাল নয়।

দত্তগুপ্ত গিয়ে মিটসেফের ওপরে রাখা একটা স্ট্রিপ থেকে একটা ট্যাবলেট ছিঁড়ে ব্যাগ্র হাতে মুখে পুরলো। তারপর কাঁপা গলায় বললো, জলের গ্লাসটা দিবি? ওই মেঝের ওপর—

তোমার সেবা করার কথা নাকি আমার?

দত্তগুপ্ত জবাব দিলো না। দাঁড়িয়ে চোখ বুজে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছে।

আমি জলের গেলাসটা তুলতে নিচু হতেই একটা কিছু ঘটলো। কী ঘটল তা আমি দেখতে পাইনি। কিন্তু ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ে একটা মুভমেণ্ট, একটা অপ্রত্যাশিত শিল্পকর্ম ধরা পড়লো ঠিকই। চকিতে যখন সোজা হয়ে তাকালাম তখন বড্ড দেরী হয়ে গেছে।

দত্তগুপ্ত হাতের খোলা ক্ষুরটা চোখের পলকে নিজের গলায় চেপে ধরে চোঁ করে টেনে দিল, বাঁ থেকে ডাইনে।

এরকম বীভৎস দৃশ্য আমি জীবনে দেখিনি। গলা থেকে কলের জলের মতো মোটা ধারায় রক্ত পড়ছে। দত্তগুপ্ত এক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইল হাঁ করে। তারপর দমাস করে মেঝেয় পড়ে গিয়ে হাত পা খিঁচোতে লাগলো।

আমি অবিশ্বাসের চোখে দৃশ্যটা দেখছিলাম। কতখানি জেদ, গোঁ, মনের জোর থাকলে মানুষ ক্ষুর দিয়ে আত্মহত্যা করতে পারে।

কিন্তু ভাবাবেগে তাড়িত হওয়ার মতো সময় আমার নেই। দৃশ্যটা থেকে চোখ ফিরিয়ে আমি গিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা টেনে দিলাম।

রক্ত বা হিংস্রতা দেখে ঘাবড়ে যাওয়ার লোক আমি নই ঠিকই। কিন্তু যে-নিষ্ঠুরতায় দত্তগুপ্ত নিজেকে শেষ করলো সেরকম ভয়ংকর ঘটনা আমি কখনও প্রত্যক্ষ করিনি। আমার একটু বমি-বমি লাগছে। হাত পায়ে কাঁপুনি না থাকলেও, শিহরণ টের পাচ্ছি। দত্তগুপ্তকে নিজের হাতে খুন করার যথেষ্ট কারণ আমার থাকলেও হয়তো শেষ অবধি তাকে খুনটা আমি করতাম না। এসব ব্যাপার থেকে আমি অনেক দূর সরে এসেছি। তাই তার মৃত্যুটা আমার কাছে ভারী অদ্ভুত আকস্মিক আর অনভিপ্রেত। আবার তার মৃত্যুতে সবকিছুর যে সমাধান হয়ে গেল তাও নয়।

আমার কাজও শেষ হয়নি। মোটরবাইকের সেই ছেলেটিকে আমার দরকার। তার সঙ্গে হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে আমি পাড়া ছাড়বো।

লুকোনোর জায়গার অভাব দত্তগুপ্তর তপোবনে নেই। মেলা গাছপালা ঝোপঝাড়। মোটরবাইকটার ধার ঘেঁষেই লতানে গোলাপের মস্ত ঝরোখা। বাঁশের একটা মাচানের মতো খাড়া করা বেড়ায় ঝেঁপে উঠেছে। ছোটো ছোটো ফুলও হয়ে আছে মেলা। গুনগুন করছে মৌমাছি। কী স্বর্গীয় মনোরম দৃশ্য! এরই আড়ালে রক্তের শেষ হোলি খেলে দত্তগুপ্ত চিরকালের মতো ঘুমিয়ে পড়েছে। তার প্রিয় গাছপালা কি সেকথা জানে? টের পায়?

প্রায় ঘণ্টা খানেক ঘাপটি মেরে থাকতে হলো। দত্তগুপ্তের ঘরে এর মধ্যে কেউ গিয়ে ঢুকলো না। চারদিক অন্ধকার হয়ে গেলো। ব্যারাকের মতো বাড়িটার ভিতরে আলো জ্বলল। হয়তো ভিতরে কোনও মিটিং হচ্ছে।

এই যে ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করা এবং দাঁড়িয়ে থাকা—নিজের এই প্রতিশোধস্পৃহা দেখে আমি নিজেই অবাক। জীবনে অনেক খিস্তি শুনতে হয়েছে। দত্তগুপ্তের জনৈক অনামা চেলার একটা খিস্তি আমি সহ্য করতে পারছি না কেন? তবে কি আমার ভিতরকার তপ্ত মৌলি এখনও মরেনি? নাকি এটাও এক ধরনের ফ্রাস্ট্রেশন।

পিছনের চোরা ফটকের কাছ থেকে হঠাৎ একটা গর্জনের মতো শব্দ শোনা গেলো, আ বে শালা! এটা কী হলো? কোন শালা শুয়োরের বাচ্চা করেছে?

বুঝলাম চোরা ফটক দিয়ে আসতে গিয়ে কেউ পড়ে থাকা ছেলেটাকে দেখতে পেয়েছে।

চিৎকার শুনে ব্যারাকবাড়ির দরজা খুলে জনা চারেক ছোকরা বেরিয়ে এল।

তপোবনের ভিতরে আগে দত্তগুপ্ত কাউকেই থাকতে দিত না। আজকাল দিচ্ছে। তার মানে দত্তগুপ্ত ইদানীং আরও সতর্ক হয়েছিল।

চারটে ছেলে দৌড়ে গেলো ফটকটার দিকে। একজন একটু বাদেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ফিরে এলো। চিনলাম, বুড়ান।

বুড়ান এসে দড়াম করে দত্তগুপ্তের ঘরে ঢুকে বললো, দত্তগুপ্তদা, টোপকাকে কে যেন মেরেছে!

বলেই বুড়ান চুপ করে গেলো।

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার তীক্ষ্ণ চোখ দত্তগুপ্তের ঘরের দিকে। বুড়ান কয়েক সেকেণ্ড পরে লাফ দিয়ে ছিটকে বাইরে এসে পড়ল। কাঁপছে, গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না।

আমি ধীরে সুস্থে এগিয়ে গিয়ে বুড়ানকে ধরলাম। গলার কাছেই পুলওভারটা খামচে এবং মুচড়ে এমন লোহার হাতে ধরলাম যাতে গলা দিয়ে স্বর না বেরোয়।

শোনো ইতর, যে মেয়েছেলের গায়ে হাত তোলে সে মরদ নয়।

বুড়ান জবাব দিলো না। সে অবস্থা তার নয়। রক্ত দেখে ঘাবড়ে

গেছে। আমার হাতে ধরা পড়ার আকস্মিকতাতেও তার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। গায়ে গতরে জোর আর দলের মদতে কিছু মস্তানী করা ছাড়া যে নিতান্তই অ্যামেচার। সবে হাতেখড়ি হচ্ছে।

দুটো ঘুঁষি তাকে খুব ওজন করেই দিলাম। একটা পেটে, অন্যটা মাথায়। খুব জোরে নয়। তাতে মরে-টরে যেতে পারে।

বুড়ান প্রথমটাতেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তাকে ফেলে দিয়ে আমি আবার ঝোপটার কাছে চলে এলাম।

সামনে একটা দৌড়োদৌড়ি ছোটাছুটি হচ্ছে। আহত ছেলেটিকে বয়ে নিয়ে এলো জনা চারেক। ব্যারাকবাড়িতে তাকে ঢুকিয়ে নেওয়ার পরই একজন ছুটে বেরিয়ে এলো। এবং সে সোজা ছুটে এলো মোটর-বাইকটির দিকেই। বোধহয় ডাক্তার এবং দলবলকে খবর দিতে যাচ্ছে।

অন্ধকারেও তাকে চিনতে আমার কষ্ট হয় না। এই সেই খিস্তিবাজ।

মোটরবাইকে ওঠার মুহূর্তে তাকে পিছন থেকে ধরলাম। একটি হাত মুচড়ে অন্য হাতে ঘাড়টা ধরলাম জুডো লক্-এ। মোচড়টা আর একটু কষে দিতেই মজবুত হাতটা মট করে ভেঙে গেলো।

ছেলেটা গোঁ-গোঁ আওয়াজ করছিল। তার পকেট থেকে একটা পিস্তল টেনে বের করে নিজের পকেটে ভরলাম। তারপর তাকে টেনে দাঁড় করালাম।

ছেলেটা অর্ধ-অচেতন। টলছে।

বললাম, চেনো আমাকে শুয়োরের বাচ্চা?

ছেলেটা চোখে নিশ্চয়ই ভাল দেখতে পাচ্ছে না। তবু গোঙানির স্বরে বললো, তুই শালা মৌলি, খানকির—

দু'হাতে তার চোয়াল চেপে ধরে হাঁ করালাম। তলার দিকটা এত জোরে টানলাম যে চড়াক করে গালের চামড়া চিরে গেলো। আর মেরে কি হবে? তিনমাস হাসপাতালের কেস।

তবে অজ্ঞান হয়নি। তাই বললাম, মৌলিকে খিস্তি দিয়ে এ পাড়ায় থাকা যাবে না। ব্যাপারটা বুঝে দেখো।

পিস্তলটা আমার কাজে লাগবে কিনা বুঝতে পারছি না।

এর মধ্যেই দুটো ছেলে ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এল। একজন চেঁচিয়ে বললো, গোপী এখনও যায়নি তো! মোটরবাইক তো রয়েছে দেখছি।

অন্যজন বললো, পেচ্ছাপ-টেচ্ছাপ করছে হয়তো। বুড়ানটাই বা কোথায়?

দত্তগুপ্তদাকে খবর দিতে গেছে।

দুটো টর্চের আলো ধাঁধিয়ে উঠলো। চারদিকে ঘুরে বেড়ালো বর্শার ফলার মতো।

একজন খামোখা বলল, শালা! টোপকাকে কে মারতে পারে বল তো?

কেউ মারেনি, শালা খানকির ছেলে ড্রাগ-ফাগ খায় বোধহয়। পড়ে গিয়ে চোট হয়েছে।

তুই ঠিক জানিস ড্রাগ খেত?

আন্দাজ করছি।

দত্তগুপ্তদার ঘরে আলো জ্বলছে না দেখছিস।

তাই তো!

কিছুক্ষণ দুজনে চুপচাপ। তারপর দুজোড়া পা এগিয়ে আসতে লাগলো।

আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। এবার আমার এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল। গুণ্ডা দমন করা আমার কাজ নয়। যথেষ্ট হিংস্রতা আজ আমি প্রকাশ করেছি। এতটা করার বোধহয় দরকার ছিল না। এর প্রতিফল আমার বাড়ির লোক আর পাড়ার লোককেও বোধহয় পেতে হবে। কিন্তু আমার পালানো ছাড়া গত্যন্তর নেই! তবে পালানোর পথ কতটা খোলা আছে বুঝতে পারছি না। পিছনের ফটকে নিশ্চয়ই আর কেউ এখন পাহারা দিচ্ছে। সামনের ফটকে

দুজন সব সময়েই থাকে আজকাল। আমি তাই একটু অপেক্ষা করছিলাম।

ছেলে দুটো দত্তগুপ্তর ঘরে ঢোকার আগেই গোপীকে দেখতে পেলো। নিথর হয়ে পড়ে আছে মাটিতে।

তারপরেই তুমুল চিৎকার করে উঠল দুজনে। সঙ্গে সঙ্গেই পিস্তলের শব্দ হলো।

কোন শালা বে···কোন···

অশ্রাব্য গালাগালে বাতাস গরম হয়ে উঠল। ব্যারাকবাড়ি থেকে বোধহয় এলো আরও তিনজন।

তারা এসে দেখতে পেলো প্রথমে বুড়ান, তারপর দত্তগুপ্তকেও।

মোটরবাইক চালিয়ে একজন ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলো।

এবার আমাকে পালাতেই হবে। উপায় নেই। রাস্তাটা পেরিয়ে আমি ঝোপঝাড়ে ঢুকে পড়লাম। চারদিকে সন্ধানী টর্চ ঘুরছে। যতগুলো আলো ছিল সব জ্বালিয়ে দিয়েছে ওরা। দুমদাম গুলি ছুঁড়ছে এদিক ওদিক। অপ্রস্তুত, বিভ্রান্ত এরা কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। এইসব শৌখিন শিক্ষানবীশদের দিয়ে দত্তগুপ্ত কী করে সাম্রাজ্য চালাত বোঝা ভার। তবে আসল কথাটা এই, এখনকার মস্তানদের লোকে ভয় খায়। আর ভয়টাই ওদের রক্ষাকবচ। দত্তগুপ্তর দুর্গ যে তেমন শক্তপোক্ত নয় তা তো বুঝে নিতে আমার গা ঘামাতেও হলো না। কিন্তু বুঝতে আর আসছে কে? কার এত বুকের পাটা যে, ফটক পার হয়ে তপোবনে হানা দেবে?

চোরা ফটকে আলো জ্বলছে, দুটো ছেলে দু ধারে দাঁড়িয়ে। খুব উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে দু'জনে।

আমি পিস্তলটা টেনে বের করে হাতে নিলাম। বেশ ভারী এবং শক্তিশালী জিনিস। কিন্তু এসব চালানোর ধাত

আমার নয়। খুনখারাপী করাও আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। বুড়ান আর গোপীকে পেটানোর দরকার ছিল। ব্যস্। সেটা হয়ে গেছে। এখন আমার কাজ হলো নিরাপদে ফটকটা পেরিয়ে চলে যাওয়া।

হঠাৎ ভিতরবাড়ি থেকে একটা ছেলে দৌড়ে আসতে আসতে চেঁচিয়ে বললো, খুন! খুন! দত্তগুপ্তদা মার্ডার হয়েছে। শ্যামল! শুভ!

ছেলেদুটো বাঘের মতো ঘুরে দাঁড়ালো। তারপর ভিতরবাড়ির দিকে দৌড়ে চলে গেলো।

বাঃ! চমৎকার! এরকম যে হবে কে জানত? এত সহজে ও নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়া যাবে?

আমি ফটকটা ঠিক যেভাবে ঢুকেছি সেভাবেই পার হলাম।

কে যেন চেঁচাল, আবে শালা, মৌলি! মৌলি করেছে! বুড়ানের জ্ঞান ফিরেছে এইমাত্র। বলল।

আমি দ্রুত পায়ে হাঁটছিলাম। সেটাই ভুল হলো। উচিত ছিল আঘাটায় নেমে রেললাইনের দিকে যাওয়া।

কয়েকটা ছেলে কোথা থেকে গন্ধ পেয়ে যে দৌড়ে এলো তা বুঝলাম না।

দৌড়োতেই যাচ্ছিলাম। দুমদাম করে কয়েকটা গুলির শব্দ হলো।

ব্যথা বেদনা কিছুই টের পাইনি, শুধু ধাক্কার মতো একটা কিছু লাগল শরীরে।

তারপর দেখছি হাসপাতালের ঘর। অনেক নার্স-টার্স। হাতে ছুঁচ বেঁধানো, ওল্টানো বোতল থেকে স্যালাইন গ্লুকোজ ঢুকছে শরীরে।

বাঁচবার ইচ্ছেটা চলে গিয়েছিল। এইসব দেখে মনে হলো, বাঁচাও বেশ ভাল ব্যাপার।

বেশ কয়েকবার জেগে উঠেও ফের ঘুমে তলিয়ে যাচ্ছিলাম। শরীর এত দুর্বল যে হাতখানা নাড়ানোরও ক্ষমতা নেই। মনটা বিষণ্ণ, তেতো। আচ্ছন্নতার মধ্যেও কতবার যে দত্তগুপ্তকে দেখলাম। কখনও দেখি বাগানে গাছের গোড়ায় মাটি আলগোছ করছে, কখনও হরিণকে কচি লেবুপাতা খাওয়াচ্ছে, কখনও শান্ত স্বরে চেলাদের বলছে, যাও, খতম করে এসো···

বুড়ানকে মেরেছি বলে শিবানী আমার ওপর খুশি নাও হতে পারে। গোপীকে মেরেছি, তারও শোধ অপেক্ষা করছে আমার জন্য। বেঁচে লাভ কী? কেন এরা বাঁচাতে চাইছে আমাকে?

এক সকালে বেড-এর পাশে দেবব্রতকে বসে থাকতে দেখে ভারী অবাক হলাম।

আপনি?

দেবব্রতকে একটা সাদা স্পোর্টস জামায় স্যামসনের মতো দেখাচ্ছে। চমৎকার হেসে বললো, আমিই।

আপনি আমেরিকায় চলে যাননি?

যাবো, দেরী আছে, কিন্তু আপনি এ কী কাণ্ড করেছেন বলুন তো! এ তো প্রায় সুইসাইড।

আমি ভারী হতাশার গলায় বললাম, কিছুই করিনি। অন্তত ভেবেচিন্তে করিনি। কী হয়েছিল তা ভাল মনেও পড়ে না।

আপনি আর একটু বিশ্রাম নিন, আমি কাল আবার আসব।

আসবেন।

দেবব্রত চলে গেল। আমি কী করে বেঁচে আছি তা আমি বুঝতে পারছি না। দত্তগুপ্তের তপোবনের কী অবস্থা শেষ পর্যন্ত হল তাও জানি না। আমি সর্বশেষ কোনও খবর

পাইনি। আগ্রহও নেই। একটা অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার দরকার ছিল। সেটা নেওয়া হয়েছে। আর কিছু জানবার দরকারই আমার নেই।

কিন্তু সুপারম্যানের মতো কেনইবা আমি এতসব বাহাদুরি করতে গেলাম তাও ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। এখন মনে হচ্ছে ভারী ছেলেমানুষী করা হয়েছে। দত্তগুপ্ত আমার জন্যই আত্মঘাতী হল, আরও দুএকজন হাসপাতালে, কিন্তু এতে আমার জীবনে তো কোনও পরিবর্তন ঘটল না। কিছুই হলো না, শুধু শিবানীর ভাইকে বাঁচানোর একটা অস্পষ্ট তাগিদ হয়তো ছিল। কিন্তু বুড়ানকে কি সত্যিই তুলে আনা সম্ভব ওই গাড্ডা থেকে? আমার হামলায় ওরা সাময়িক বিপর্যস্ত হয়ে গেলেও আবার জোট বাঁধবে, দত্তগুপ্ত যে প্রসেস শুরু করে দিয়ে গেছে তাকে ঠেকানো মুশকিল।

হাসপাতালে শুয়ে থেকে থেকে এসব আকাশ-পাতাল ভাবছি।

আমার বাড়ির লোকেরা বহুদিন হল আর আমার আপনজন নেই। তবু এই ঘটনার পর তারা দুবেলাই আসছে। বিকেলে রীতিমতো দল বেঁধে, আমার নতুন ওয়েট লিফটার ছাত্ররাও আসে। আসে পাড়ার লোক। সকলেই আমার কৃতিত্বের কথা বলতে চেষ্টা করে। তবে বেশী নয়, রুগীর ঘরে বেশী কথা বলা বারণ তো! শিবানীও এলো, তবে আমার জ্ঞান ফিরে আসবার অন্তত দিন তিনেক পর। তার চোখ-মুখে সেই উৎকণ্ঠাটা নেই।

বিছানার পাশে বসে বললো, সব শুনেছেন?

কিছু কিছু।

কী শুনেছেন?

আপাতত দত্তগুপ্তের দল একটু বেকায়দায় পড়েছে। তবে খুব বেশী কিছু কেউ আমাকে বলে না।

খবরের কাগজেও বেরিয়েছে।

তুমি এতদিন আসোনি কেন ?

আমাকে দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল আপনার ? কী ভাগ্যি !

হেসে বললাম, তুমিতো দেখতে খারাপ নও।

আপনার মুখে কথাটা শুনতে ভাল লাগল না। ওরকম বলবেন না।

বুড়ানকে সেদিন আমি কিন্তু মেরেছিলাম।

জানি, বেশ করেছিলেন, তাকেও হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। ক’ বোন ডিসলোকেশন।

তত জোরে মারিনি তো !

আপনার গায়ের জোর সম্পর্কে নিজের কোনও ধারণাই নেই। বুড়ান এখন গুম হয়ে ঘরে বসে থাকে।

পুলিস আমার কাছে এলো না কেন বলো তো ? খুব স্বাভাবিক ছিল আমাকে জেরা করতে আসা !

আসবে, তাদের ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে।

কে ঠেকাচ্ছে ?

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে।

কেন বলো তো !

সে অনেক কথা। তবে এটুকু জেনে রাখুন আপনি ওই কাণ্ড করার পর পাড়ার লোকই ক্ষেপে গিয়ে দত্তগুপ্তের ডেরা ভেঙেছে। ওর দলের আরও কয়েকটা ছেলে বাইরে ছিল। জনা কুড়ি হবে। তাদের সবাইকে পিটিয়ে পাড়া-ছাড়া করেছে।

বলো কী ? আমি বিস্ময়ে উঠে বসার চেষ্টা করি, এ তো ভাবা যায় না।

কে পাড়ার লোককে উত্তেজিত করেছে জানেন ?

তুমি। নিশ্চয়ই তুমি।

শিবানী মাথা নেড়ে বলল, মোটেই নয়। আমার সেই ক্ষমতা নেই।

তাহলে কে?

তার নাম শুনলে হয়তো বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু ঘটনাটা সত্যি।

বুকটা একটু কেঁপে গেল। বললাম, কে?

রুমকিদি। সেই রাতে আপনাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে অনেক রাতে ফিরে এল রুমকিদি। কোত্থেকে একটা লাউডস্পিকার আর মাইক জোগাড় করেছিল কে জানে। চেঁচিয়ে সবাইকে বললো, কেন আপনারা শেয়ালের মতো গর্তে লুকিয়ে আছেন? কেন এ পাড়ায় এরকম গুণ্ডামি হয়ে যেতে দেবেন? একবার এগিয়ে এসে দেখুন, ওরা কত দুর্বল। আজ মাত্র একটা লোক ওদের ডেরায় সাহস করে ঢুকেছিল, তাইতেই ওদের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। আর সবাই যদি এগিয়ে আসেন তাহলে ওরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

কাঁপা বুকে আমি ভূতগ্রস্তের মতো চেয়ে থাকি, এ হতে পারে না। রুমকি! গলা দিয়ে বিস্ময়ে আমার স্বর বেরোলো না।

শিবানী বলল, কী সাহস রুমকিদির! তখন দত্তগুপ্তের বাড়িতে কুড়ি পঁচিশটা গুণ্ডা জমায়েত হয়ে দমাদম বোম ফাটাচ্ছিল লোককে ভয় দেখানোর জন্য। আর কী অশ্লীল স[illegible] গালাগাল। রুমকিদি যখন মাইকে সবাইকে উত্তেজিত করছিল তখ[illegible] তপোবন থেকে তারা দৌড়ে বেরিয়ে এলো। হাতে পিস্তল, ছোরা, রড।

উত্তেজনায় আমার বুকে হাতুড়ি পড়তে থাকে। ককিয়ে উঠে বলি আর রুমকি?

শিবানী ম্লান একটু হেসে বলে, রুমকিদি একেবারে বেঁচে যায় নি। বোমার টুকরো লেগেছে কয়েকটা। গাড়ির মধ্যে বসেছিল বলে ইনজুরি তওটা হয়নি। অথচ কী সাহস দেখুন। বোমা খেয়েও চিৎকার করে সবাইকে উত্তেজিত করে গেছে ঠিকই। আর তার পরেই কী যে হলো, দলে দলে মানুষ দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে লাগল। প্রত্যেকের হাতেই লাঠিসোঁটা, সে দৃশ্য না দেখলে বিশ্বাস হয় না। চারদিক থেকে ঘিরে ইটপাটকেল লাঠি দিয়ে কী মার! অন্তত জনা দশেক সিরিয়াসলি ইনজিওরড। দু'জন মারা গেছে। বাদবাকী পালিয়ে গেছে। তারপর সেই রাতেই দত্তগুপ্তের বাড়ি ভেঙে তছনছ করে দিয়ে আসে সবাই। ভোরের দিকে পুলিস আসে। তারা ধরেই নিয়েছে এটা মব অ্যাকশন। আপনার নাম কেউ তাদের কাছে বলেনি।

কেন বলেনি?

সেই রাতেই শান্তি কমিটির মিটিং হলো। সবাই বললো, মৌলি দত্তগুপ্তের ষড়যন্ত্রেই জেল খেটে এসেছে। এক কালে সে মস্তান ছিল বটে, কিন্তু পরে ভাল হয়ে যায়। তার নাম পুলিসের কাছে কেউ যেন না বলে। তাহলে পুলিস তাকে আবার ধরবে।

আর রুমকি?

খুব ভাবছেন রুমকিদির জন্য? কিছু হয়নি। আজই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবে। গ্রেভ ইনজুরি নয়। আপনি বললে বিশ্বাস করবেন না, রুমকিদি ওই ইনজিওরড অবস্থায় রক্তমাখা শরীরেও কীরকম প্রাণপণে চেঁচিয়ে সবাইকে ডাকছিল।

আমি উঠে বসলাম, রুমকির কোথায় লেগেছে শিবানী?

কপালে একটু গভীর ক্ষত হয়েছিল। আর হাতে। ডান হাতের কড়ে আঙুলটায় বেশী।

কত বেশী ?

বোধহয় একটা কর উড়ে গেছে। ভাববেন না মৌলিদা, সেই রাতে রুমকিদির মরার কথা ছিল। সেই তুলনায় অনেক অল্পের ওপর দিয়ে গেছে।

আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, ওকে কে এই রিস্ক নিতে বলেছিল ?

বলেছিল আপনার প্রতি ওর ভালবাসা। অবশ্য দেবব্রতর কথাও বলতে হবে। দুর্জয় সাহস। ও না থাকলে আপনি বাঁচতেন না। শুনেছি আপনার অবস্থা দেখে রুমকিদি ভয়ে অজ্ঞান হওয়ার জোগাড়। দেবব্রতই আপনাকে পাঁজা কোলে তুলে নিয়ে গাড়িতে ওঠায়। দেবব্রত নিজেও সে রাতে প্রচণ্ড মারপিট করেছে। কী রাগ ওর! এক একটা ঘুঁষিতে যেন মুণ্ডু উড়িয়ে দিচ্ছে এক একজনের। একেবারে অরণ্যদেব।

আমি শিউরে উঠে বলি, ওরও এর মধ্যে আসবার দরকার ছিল না। আমি তো জানতামও না যে, আমাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছিল দেবব্রত আর রুমকি।

কেউ কিছু বলেনি আপনাকে, বলা বারণ ছিল।

কে বারণ করেছিল ?

রুমকিদি। বাবা রুমকিদির কী দাপট! এক রাতে একটা ওয়ার্কিং গার্ল যেন দেবী চৌধুরানী হয়ে গেল। নিজের ওরকম হেমারেজ হচ্ছে তবু আপনার সম্পর্কে সবাইকে সাবধান করে দিচ্ছে। যেন রাতে হাসপাতালে গিয়ে পাহারা দেয়, যাতে গুণ্ডারা প্রতিশোধ নিতে সেখানে হানা দিতে না পারে। আপনার সম্পর্কে কেউ যেন পুলিসকে কিছু না বলে। আপনাকেও যেন কিছু না বলা হয়।

আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। আমি ফের ককিয়ে উঠলাম

অন্তর্গত যন্ত্রণায়। এত কেন করতে গেল রুমকি? আমি তো মুছে গেছি।

শিবানী মাথা নীচু করে একটু চুপ করে রইল। তারপর যখন মুখ তুলল ওর চোখে টলটল করছে জল। একটু ধরা গলায় বলল, দেবব্রত বড় ভুল করেছে মৌলিদা। রুমকিদির ওই চেহারা দেখে তার ভুল ভাঙল। আমাকে পরদিনই বলেছে, শিবানী, এ জিনিস দেখার জন্য সাত হাজার মাইল উড়ে আসা সার্থক। এ তো ভাবা যায় না। আমিও বলি মৌলিদা, ওরকম ভালবাসা বাসতে পারলে আমিও বোধহয় বর্তে যেতুম।

আমি হার্টফেল হয়ে মরে যাবো কিনা বুঝতে পারছি না। বুকের মধ্যে উথাল-পাথাল।

শিবানী বললো, হাসপাতালে শুয়ে থেকেও কতবার খোঁজ নিচ্ছে আপনার। কাঁদছে হাউ হাউ করে।

বলো কী? এসব সত্যি নয়।

দেখবেন। বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শিবানী উঠল। চলে গেলো।

দেখলুম আরও কয়েকদিন পর।

হাসপাতাল থেকে আমাকে বাড়িতে আনা হয়েছে। পাড়ার মুরুব্বি মাতব্বরেরা ভীড় করে আমার বাড়িতে আসছেন দুবেলা। মিটিং হচ্ছে। তাদের বক্তব্য, মৌলি এবার পাড়ার মধ্যে একটা ভাল ক্লাব করুক। ব্যায়াম-ট্যায়াম করুক ছেলেরা। দত্তগুপ্তের আখড়াটা বাচ্চাদের পার্ক হোক, কারণ দত্তগুপ্ত নিজেই সেরকম ব্যবস্থা করে গেছে। সেই পার্কেই জিমন্যাসিয়ামও হতে পারবে।

একদিন কালী, মদন আর টুলু এসে দেখা করে গেল আমার সঙ্গে। লাইনের ওপারে এখনো তাদের রাজত্ব। একটু বাজিয়ে বুঝে গেল, আমি ঠিক কী করতে চাইছি। উঠবার সময় কালী বললো, তুমি যদি

লাইনের ওধারে হাত না বাড়াও আমি কথা দিচ্ছি আমার ছেলেরা এদিকে হুজ্জত করবে না।

আমি কালীর দিকে চেয়ে বললাম, কালী, তুমি ভালই জানো এদিকে হুজ্জত করে লাভও নেই। তবে এপাড়ার মতো ও পাড়ার লোকও যদি একদিন জোট বাঁধে তবে কোথায় যাবে ?

কালী হাসল, কী যে বলো বস ! ডেমোক্র্যাসী অত সহজ নয়। গুড নাইট।

দেবব্রত এক সকালে এসে বললো, আমরা চলে যাচ্ছি।

বিবর্ণ মুখে বললাম, বাঃ বেশ !

দেবব্রত একটু হেসে বলল, আমরা বলতে অবশ্য আমি আর বাবা। অন্য কেউ নয়।

একটু বাধো বাধো ঠেকল, তবু বললাম, আর রুমকি ?

সে যাচ্ছে না।

তাহলে কি পরে যাবে ?

দেবব্রত ভারী স্পোর্টসম্যানের মতোই হেসে বললো, সে এখানকার অনেক কিছুই ছেড়ে যেতে রাজী নয়। ধরুন তার ব্যবসা, তার ফ্ল্যাট—

আর কী ?

আরও কিছু আছে নিশ্চয়ই। তবে বলতে চাইছে না।

কিন্তু আপনারা তো এদেশে থাকতেই এসেছিলেন !

হ্যাঁ। কিন্তু শেষ অবধি বাবা মত পালটালেন। বাড়িটা বুধোদারা বিক্রি করে টাকা যে-যার ভাগ করে নেবে। বাবাকে রাজি করানো হয়েছে। আর বাবাও শেষ অবধি দেখল আমাকে ছাড়া তার চলবে না। আমিও বাবাকে ভীষণ ভালবাসি।

দেবব্রতরা চলে গেল তার পরদিন। বিকেলে আমি বেরোলাম।

জিমন্যাসিয়ামে গিয়ে অনেকক্ষণ লিফটারদের সঙ্গে সময় কাটালাম। শরীরটা আবার সম্পূর্ণ সুস্থ হলে শেখাতে আসবো। দুর্বলতা কেটে যাচ্ছে। শরীরে এবং মনে একটা নতুন কিছু হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, বাঁচতে ইচ্ছে করছে।

একটু রাত করেই জিমন্যাসিয়াম থেকে বেরোলাম। খুব দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে, ভারী লজ্জার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে পৌঁছোলাম রুমকির কারখানার দরজায়। রুমকি অনেক রাত অবধি কাজ করে, আমি জানি।

দরজায় টোকা দিয়ে অপেক্ষা করতে করতে টের পেলাম, বুকের মধ্যে ঝড় বইছে।

দরজা খুলল রুমকিই, কত রোগা হয়ে গেছে। পাঁশুটে ভাবটা এখনও আছে মুখে। কত কাল পরে মুখোমুখি দু'জনে!

রুমকি ভ্রু কুঁচকে চেয়ে বললো, বেরিয়েছো যে!

যেন রোজ ওর সঙ্গে দেখা হয় এমন ভাবখানা।

বললাম, ঘরে ভালো লাগছিল না, জিমন্যাসিয়াম ঘুরে এলাম।

জিমন্যাসিয়াম! এই শরীরে!

একটু ভয় খেয়ে বললাম, ঠিক আছি তো!

ঘরে ঢুকিয়ে দরজাটি বন্ধ করে দিয়ে রুমকি তার কাজ গোছাতে গোছাতে সাহায্যকারিণী মেয়েটিকে ডেকে বলল, আজ আর হবে না, সব গুছিয়ে ঘর বন্ধ করে দাও, আমি বাড়ি যাচ্ছি।

দু'জনে বেরিয়ে এলাম। গাড়ি ছেড়ে রুমকি বললো, আমার তাহলে কী হবে?

কী হবে?

আমার একজন গার্জিয়ানের দরকার ছিল। শক্তসমর্থ এক সঙ্গীর, শুনছি তাকে আধখানা খেয়েছে পাড়ার লোক, বাকি আধখানা এক জিমন্যাসিয়াম। আমার তাহলে কী হবে?

মৃদু একটু হাসলাম, বেকারদের কত কাজেই তো লোকে লাগায়।

বেকার বুঝি?

নই?

বেকারই তো ভালো, নইলে আমার বেগার খাটবে কে?

আমি ওকে কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদ জানাইনি। জানি ওটার কোনও মানেই হয় না। আমার প্রাণ বাঁচানোর দায় তো রুমকিরই।

গাড়ির ভিতর ঝুঁঝকো আলোয় রুমকি একবার আমার দিকে তাকালো। তারপর মিষ্টি একটু হাসলো। কিছু বলার দরকার হলো না।

—শেষ—